হেগেল ও মার্কস

রেবতীমোহন বর্মন

হেগেল ও মার্কস

রেবতীমোহন বর্মন

এন বি এ

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড

প্রথম সংস্করণ : ডিসেম্বর, ১৯৯৪
দ্বিতীয় সংস্করণ : নভেম্বর, ২০০০
তৃতীয় সংস্করণ : জুলাই, ২০০২
পঞ্চম সংস্ককরণ : জানুয়ারী, ২০০৪
সপ্তম মুদ্রণ : সেপ্টেম্বর, ২০০৬
অষ্টম মুদ্রণ : সেপ্টেম্বর, ২০০৭
নবম মুদ্রণ : সেপ্টেম্বর, ২০০৮

প্রকাশক :
সলিলকুমার গাঙ্গুলি
ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড
১২ বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

মুদ্রক :
সমীর দাশগুপ্ত
গণশক্তি প্রিন্টার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৩৩ আলিমুদ্দিন স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০০১৬

দাম : সাত টাকা

নিবেদন

বর্তমান গ্রন্থের প্রথম প্রবন্ধটি লেখা হইয়াছে প্রসিদ্ধ গ্রন্থ Capital-এ সন্নিবিষ্ট মার্কস-এঙ্গেলস-এর মুখবন্ধগুলি অবলম্বনে। দ্বিতীয় প্রবন্ধটি হেগেলের Philosophy of History-র সুবৃহৎ ভূমিকাখানি অবলম্বন করিয়া লিখিয়াছি। তৃতীয় ও চতুর্থ প্রবন্ধের মালমশলা সংগৃহীত হইয়াছে প্লেখানভের Essays on the History of Materialism-এর Marxism-এর অধ্যায় এবং Capital প্রথম ভাগের পঞ্চম পরিচ্ছেদ হইতে। মার্কসবাদ যাঁহারা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং মার্কসবাদ সম্বন্ধে যাঁহারা বিশেষজ্ঞ তাঁহাদের নিজেদের লেখার সারাংশ পাঠকগণের সম্মুখে উপস্থিত করাই সমীচীন মনে করিলাম। হেগেল দর্শন সাধারণত আমাদের নিকট দুর্বোধ্য ; কিন্তু চমৎকার গ্রন্থ Philosophy of History-তেই হেগেল তাঁহার দার্শনিক-তত্ত্বকে সহজে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। বাংলার জাগতবুদ্ধি তরুণমন যে ধীরে ধীরে হেগেল দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট হইবে তাহা নিঃসন্দেহ। প্রবন্ধগুলি লেখা হইয়াছে বহুবিধ অসুবিধার ভিতরে। সুতরাং ভুল-ত্রুটি-অসম্পূর্ণতা রহিয়াছে যথেষ্ট।

৯ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৮

—গ্রন্থকার

মার্কসের বিচার রীতি

মার্কসতত্ত্বের একটি সাধারণ এবং সর্বাঙ্গীণ পরিচয় আমরা লাভ করিতে পারি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'কেপিটেলে' সন্নিবিষ্ট মার্কস ও এঙ্গেলস-এর মুখবন্ধগুলি হইতে। একটি পণ্য কি কারণে অপর একটি পণ্যের সহিত বিনিময় হয়, অথবা একটি বিশেষ পরিমাণের মুদ্রায় বাজারে বিক্রয় হয়, প্রতিদিনের এই ঘটনাটির পশ্চাতে যে রহস্য লুক্কায়িত রহিয়াছে তাহার উদ্ঘাটন মার্কসের পূর্বে দুই হাজার বৎসর সম্ভবপর হয় নাই। এরিস্টটল ইহার উত্তর দিতে চেষ্টা করিয়াছেন ; এডাম স্মিথ এবং রিকার্ডো অনেকখানি অগ্রসর হইয়াও সফল হন নাই। এই দুই হাজার বৎসরে অনেক রকমের বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং আবিষ্কার সম্ভব হইয়াছে ; কিন্তু পণ্যে মূল্যরূপের (value form) মতো একটি ক্ষুদ্র প্রতিদিনের প্রত্যক্ষের বিষয় সম্বন্ধে সত্য-উদ্ঘাটন মার্কসের পূর্বে সম্ভব হয় নাই। ইহার কারণ কি ? সমগ্র দেহটি সম্বন্ধে বিচার ও বিশ্লেষণ যত সহজ, তাহার মূল-ভিত্তি জীবকোষ সম্পর্কে ধারণা তত সহজ হইতে পারে না।

অর্থনৈতিক-কাঠামো সম্পর্কে বিচার আরো কঠিন। ইহার জন্য যেমন কোন বিজ্ঞানাগার নাই, তেমনি পর্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষণের জন্যও কোন অনুবীক্ষণ যন্ত্র অথবা রাসায়নিক পরীক্ষা প্রক্রিয়া নাই। সামাজিক বিষয়ে যে উপায় এবং চিন্তা-প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে, তাহা হইল বিয়োজনরীতি (abstraction)। মানুষের শ্রমজাত দ্রব্যের পণ্যরূপ (commodity form) অথবা পণ্যের মূল্যরূপই হইল বুর্জোয়া-সমাজের অর্থনৈতিক জীবকোষ। ইহাকে ভিত্তি করিয়া এবং মূল ধরিয়া বুর্জোয়া অর্থনৈতিক সমাজ কাঠামোকে পরিষ্কার বুঝা যাইবে।

মার্কসের বিচারের বিষয় পুঁজিতন্ত্রী সমাজের অন্তর্ভুক্ত উৎপাদন-প্রথা এবং বিনিময়-ব্যবস্থা। মার্কসের সময়ে আদর্শ পুঁজিতন্ত্রী-সমাজ ছিল ইংল্যান্ড। ইহাই একমাত্র কারণ, কেন মার্কস তাঁহার বৈজ্ঞানিক মতবাদ গড়িয়া তুলিবার জন্য সাক্ষ্য ও নিদর্শনরূপে ধরিয়াছেন ইংল্যান্ডকে। পুঁজিতন্ত্রী উৎপাদনের প্রভাবে বিশেষ একটি সমাজ শ্রেণীসংঘর্ষের দিকে কি পরিমাণ অগ্রসর হইয়াছে তাহা বিশদভাবে দেখিবার বিষয় নয়। দেখিতে হইবে, এই বিশিষ্ট উৎপাদন প্রথার পশ্চাতে যে মূলীভূত সত্য এবং সূত্র রহিয়াছে তাহা কি করিয়া অবশ্যম্ভাবীরূপে এবং অপ্রতিরোধ্যভাবে তাহার আপনার গড়ন এবং ভাঙনের কাজ করিয়া যাইতেছে। যে দেশ আধুনিক শিল্পের দিক হইতে অধিক অগ্রসর তাহার প্রভাব অল্প-অগ্রসর দেশগুলির উপর বিস্তৃত হইবেই।

প্রথমোক্ত দেশে যাহা আজ সম্ভব হইয়াছে অনুন্নত দেশগুলিতেও তাহা পরবর্তী সময়ে সংগঠিত না হইয়া পারিবে না।

সবেমাত্র শিল্পোন্নতি শুরু হইয়াছে এইরূপ দেশগুলির উপর পীড়ন হয় দুইদিক হইতে। নবোত্থিত পুঁজিতন্ত্রের অত্যাচার তো সেখানে থাকিবেই, তাছাড়া গতায়ু ফিউদ-তন্ত্রও মরণ কামড় দিতে ছাড়ে না। ইংল্যান্ডের মতন দেশে কারখানা-শিল্প উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, তাই সেখানে ফ্যাক্টরি আইনের প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছে এবং অবশেষে তাহা প্রবর্তিতও হইয়াছে। কিন্তু মার্কসের সময়ে অনুন্নত জার্মানিতে তাহা সম্ভবপর হয় নাই। অনুন্নত দেশে পুঁজিতন্ত্রের অপরিণত বিকাশ হইতে উদ্ভূত অত্যাচার তো থাকেই তা ছাড়া পুরাতন উৎপাদন-বিধির নির্যাতনও তাহাকে সহ্য করিয়া যাইতে হয়। এই অবস্থাটিকেই মার্কস বলিয়াছেন "We suffer not only from the living, but also from the dead" সকল অনুন্নত দেশই শুধু বর্তমানের চাপেই গুমড়ায় না, অতীতের দুঃসহ ভারও তাহাকে সহ্য করিয়া যাইতে হয়।

আঠার শতকে আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ দ্বারাই ইউরোপের মধ্যবিত্তশ্রেণীর জাগরণ সূচিত হয়। ঊনবিংশ শতকে আবার আমেরিকারই গৃহযুদ্ধ শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তির ইঙ্গিত জানায়। মার্কসের সময়ে ইংল্যান্ডে সামাজিক ভাঙন খুবই স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। অচিরেই ইহার প্রতিক্রিয়া ইউরোপেও অনুভূত হয়। শ্রমিকশ্রেণীর বিকাশ সেখানে কতখানি সম্ভব হইবে তাহার উপরই নির্ভর করিবে এই প্রতিক্রিয়া কত সহজে অথবা কত কঠোরভাবে ইউরোপে রূপ পরিগ্রহ করিতে পারিবে। কোনও উচ্চ এবং মহৎ ভাবের অনুপ্রেরণায় নয়, যদি আপন শ্রেণীস্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখিতে হয় তবে শ্রমিকশ্রেণীর বিকাশের পক্ষে যে সকল অন্তরায় রহিয়াছে আইনের সাহায্যে তাহা দূর করা শাসকশ্রেণীর পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন। মার্কস তাই তাহার মূলগ্রন্থ 'কেপিটেলে' ইংল্যান্ডে ফ্যাক্টরি-আইন এবং তাহার ফলাফল সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। কেননা একটি জাতি অপর একটি জাতির অভিজ্ঞতা হইতে শিক্ষা লইতে পারিবে। মার্কস কখনো কোনো ব্যক্তিকে ব্যক্তি হিসাবে দেখেন নাই। ব্যক্তিকে তিনি পুঁজিপতি, ভূস্বামী প্রভৃতি রূপেই দেখিয়াছেন। মার্কসের নিকট ব্যক্তি বিশিষ্ট শ্রেণীসম্বন্ধ এবং শ্রেণী-স্বার্থেরই প্রতিনিধি। বিশেষ একটি সামাজিক সম্বন্ধের উদ্ভব এবং বিকাশের জন্য তিনি কখনো ব্যক্তিকে দায়ী করেন নাই। ব্যক্তি হয়তো বা অন্তরে উচ্চভাব পোষণ করিতে পারে, কিন্তু অন্তরালে শ্রেণীস্বার্থের প্রভাবই তাহার উপর কাজ করিতে থাকে। ব্যক্তি প্রধানত তাহার আপন শ্রেণীরই প্রতিনিধি।

অর্থনীতির বিচারে স্বাধীন চিন্তাকে ভীষণ শত্রুর সম্মুখীন হইতে হয়। ব্যক্তিগত বিত্ত এবং শ্রেণীস্বার্থই এই শত্রু। ইংল্যান্ডের চার্চ তাহার ঊনচল্লিশ দফা ধর্মানুশাসনের আটত্রিশ দফার উপর আক্রমণ নীরবে সহ্য করিবে, কিন্তু তাহার ঊনচল্লিশ ভাগের একভাগ মুনাফার উপর হস্তক্ষেপ করিলে তাহা কখনো সহ্য করিবে না। ধর্মযাজক শ্রেণীর নিকট নাস্তিকতা ক্ষমার্হ ; কিন্তু ব্যক্তিগত বিত্তমূলক সমাজ সম্পর্কের উপর আক্রমণ অমার্জনীয়। ইহা সত্ত্বেও সংরক্ষণপন্থীদের কেহ কেহ চিন্তার দিক হইতে যে

অগ্রসর না হইতেছেন এমন নয়। শাসকশ্রেণীও ভাবিতে শিখিয়াছে সমাজ একটি জড়ীভূত নিশ্চল পদার্থ নয়। সমাজ পরিবর্তন-সাপেক্ষ এবং প্রতিনিয়ত ইহার পরিবর্তন ঘটিতেছে।

১৮৩০ পর্যন্ত জার্মানিতে বুর্জোয়া সমাজ গড়িয়া উঠে নাই। সুতরাং অর্থনীতি অথবা পলিটিকেল ইকনমির ক্ষেত্রও সেখানে তখন পর্যন্ত প্রস্তুত হইতে পারে নাই। এই বিজ্ঞানটি তখন ধার করিয়া আনিতে হইত ইংল্যান্ডে এবং ফরাসীর নিকট হইতে। জার্মানির অধ্যাপকমণ্ডলীকে তখন 'ইস্কুলের ছাত্র' ছাড়া অপর কিছু আখ্যা দেওয়া চলিত না। বিদেশে যে সকল তত্ত্ব বাস্তব হইতে জন্মিয়া সত্য হইয়া উঠিয়াছে, সেগুলিকেই তাহার নিজের দেশের অসম অবস্থায় খাটাইতে চাহিত।

১৮৪৮ হইতেই জার্মানিতে পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন প্রথার প্রারম্ভ। অর্থনীতি প্রণয়নের ক্ষেত্র এখন হইতে প্রস্তুত হইল বটে, কিন্তু অধ্যাপকগণের পক্ষে নিরপেক্ষ বৈজ্ঞানিক বিচার আর সম্ভব হইল না। যদি কেহ ভাবিতে শিখে যে পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থাই সর্বশেষ উৎপাদন ব্যবস্থা, ইহার পরিবর্তন নাই — তখন কি সে বৈজ্ঞানিকভাবে বিচার করিতে পারে?

যতক্ষণ শ্রেণীসংঘর্ষ আত্মপ্রকাশ করে নাই, ততক্ষণ নিরপেক্ষ বৈজ্ঞানিক বিচার সম্ভব হইলেও হইতে পারে। পুঁজিতন্ত্রের অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শ্রেণীসংঘর্ষ তীব্র হইয়া উঠে বলিয়াই লেখকেরা মিথ্যার শরণাপন্ন হইতে বাধ্য হয়। তাহারা বলিয়া থাকে পুঁজিতন্ত্রই সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বশেষ এবং অপরিবর্তনীয় সমাজব্যবস্থা।

ইংল্যান্ডের কথাই ধরা যাউক। শ্রেণীসংঘর্ষ যতদিন তীব্ররূপ লয় নাই ততদিন 'পলিটিকেল-ইকনমির'র বৈজ্ঞানিক ভিত্তি রক্ষা হইয়াছে। রিকার্ডো শ্রেণী-স্বার্থের সংঘাত এবং 'মজুরি ও মুনাফার' বিরোধিতাকে তাহার বিচারের মূল সত্য বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলেন। এই বিরোধ যে প্রাকৃতিক নিয়মের মতই একটি অনিবার্য সামাজিক বিধি তাহা ধরিয়া লইতে তাহার বাধে নাই। কিন্তু বৈজ্ঞানিকভাবে বিচার শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহার সমাপ্তিও ঘটিল। রিকার্ডোর জীবনকালেই সিসমন্ডি রিকার্ডো-আবিষ্কৃত তত্ত্বগুলিকে আক্রমণ করেন। ১৮২০ হইতে '৩০ — এই দশ বৎসর ইংল্যান্ডে একই সময়ে বৈজ্ঞানিক বিচার এবং বৈজ্ঞানিক বিচারের কদর্থ দুইই শুরু হইয়াছে। এই বিষয়টির পশ্চাতে রহিয়াছে ইংল্যান্ডের তদানীন্তন সামাজিক অবস্থা। একদিকে আধুনিক কারখানা-শিল্প তাহার শৈশব অতিক্রম করিয়া ১৮২৫-এ সর্বপ্রথম অর্থসঙ্কটের সম্মুখীন হইয়াছে, অপরদিকে ভূস্বামীগণের বিরুদ্ধে শ্রমিক বুর্জোয়া-নেতৃত্বে যুদ্ধের জন্য অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে। এইরূপ বিরোধিতার জন্য বুর্জোয়া-জগতের শ্রেণী সংঘর্ষ কিছুকালের জন্য ঢাকা পড়িয়াই রহিল। 'Corn-law'-এরপর অভিজাত ভূস্বামীগণের বিরুদ্ধে সংঘর্ষ খুবই তীব্র হইয়া ওঠে ; ১৯৩০ হইতেই ইংল্যান্ডে মস্ত ওলট-পালটের সৃষ্টি হইয়াছে।

ফ্রান্স এবং ইংল্যান্ডে বুর্জোয়া রাজনৈতিক অধিকার জয় করিয়া লইল। তখন হইতেই মত এবং পথ দুই দিক হইতেই শ্রেণীযুদ্ধ স্পষ্ট, সুনির্দিষ্ট এবং ভয়াবহ রূপ

ধারণ করিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গেই বুর্জোয়া ইকনমির বৈজ্ঞানিক দিকটিও একেবারেই খসিয়া পড়িল। ইংল্যান্ডে ফ্যাক্টরি অ্যাক্ট প্রবর্তনের সময়ে তাহার বিরুদ্ধে যুক্তি দর্শানোর জন্য ম্যাঞ্চেস্টারের কলওয়ালারা সিনিয়রকে নিয়োগ করে ; সিনিয়র আবিষ্কৃত "last hour" *

থিওরী একটি উদ্ভট বস্তু। বিজ্ঞানের জায়গা দখল করিয়া বসিল বিবেকহীনতা। অবশ্য সে সময়ে কবডেন এবং ব্রাইট 'Anti-corn Lawleague'-এর পক্ষ হইতে যে সকল পুস্তিকা রচনা এবং প্রচার করেন সেগুলির বৈজ্ঞানিক ভিত্তি তেমন একটা না থাকিলেও তাহাদের ঐতিহাসিক একটি দিক যে রহিয়াছে তাহা নিঃসন্দেহ।

১৮৪৮-৪৯'এর ইউরোপময় বিপ্লবের প্রতিক্রিয়া অতি সহজেই ইংল্যান্ডে অভিব্যক্ত হইল। শ্রমিকের দাবি এতোই চরমে উঠিয়াছে যে তাহাকে উপেক্ষা করা একপ্রকার অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শাসকশ্রেণীর ভিতর হইতেই একদল বাহির হইয়া আসিল, তাহারা অর্থনীতিকে পুঁজিবাদীগণের চাটুকারিতা হইতে উদ্ধার করিয়া ভদ্র পোশাক পরাইতে সচেষ্ট হইলেন। এই দলেরই প্রতিনিধি জন স্টুয়ার্ট মিল ; যে সকল বস্তুর মিশ খাওয়া প্রকৃতি বিরুদ্ধ সেগুলিকে মিশ খাওয়ানোই তাহার চেষ্টা। "irreconcilables"গুলিকে 'reconcile' করার ব্যর্থ চেষ্টায় তিনি প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এই শ্রেণীর লেখকদের সকল দিক রক্ষার চেষ্টা হইতে বুর্জোয়া ইকনমির দারিদ্র্য এবং দৌর্বল্যই প্রকাশিত হয়। ফরাসী এবং ইংল্যান্ডে পুঁজিতন্ত্রের সংঘর্ষমূলক দিকটি যখন প্রচন্ড হইয়া উঠিল, সে সময়ে জার্মানিতে পুঁজিতন্ত্র দানা বাঁধিয়াছে। ইহারই মধ্যে জার্মানির শ্রমিকেরা সে দেশের বুর্জোয়া অপেক্ষা অনেকখানি বেশি শ্রেণী-সচেতন হইয়া দাঁড়াইল। এই কারণেই, বুর্জোয়া ইকনমির প্রণয়নের যখন ক্ষেত্র প্রস্তুত এবং সময় উপস্থিত, তখনই তাহা হইয়া দাঁড়াইল অসম্ভব। এইরূপ অবস্থায় অধ্যাপকমণ্ডলী দুইভাগে ভাগ হইয়া পড়িল। কেহবা Bastiat-এর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া কদর্থ করিতেই প্রবৃত্ত হইলেন, আবার কেহ বা জন স্টুয়ার্ট মিলের পন্থা অবলম্বন করিয়া পরস্পর-বিরোধী বিষয়গুলিকে সমন্বয় করিতে মনোনিবেশ করিলেন। এই অদ্ভুত পরিস্থিতি জার্মানিতে বৈজ্ঞানিক বিচার এবং দৃষ্টি দ্বারা অর্থনীতি প্রণয়নের অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইল। কিন্তু তাই বলিয়া কদর্থমূলক অর্থনীতি সমালোচনার অভাব ঘটিল না। এই আক্রমণ আসিল সমাজের সর্বহারা শ্রেণীর প্রতিনিধিগণের নিকট হইতে।

মার্কসের মূলগ্রন্থ 'কেপিটেল' রুশ ভাষায় অনূদিত হয় ১৮৭২ সনে। রুশিয়ার প্রফেসর সাইবার 'কেপিটেল' পড়িয়া লিখেন, — মার্কস-তত্ত্ব এডাম স্মিথ এবং

* ফ্যাক্টরি অ্যাক্টের প্রবর্তন দ্বারা শ্রমিকের প্রতিদিনের শ্রমসময় দশ ঘন্টা করিবার কথা উঠে। সিনিয়র মালিকশ্রেণীর পক্ষসমর্থন করিয়া যুক্তি দেখাইলেন, শ্রমিককে দিয়া মালিক এগার ঘন্টার উৎপাদনের উপকরণাদির এবং শ্রমিকের শ্রমশক্তির মূল্য উঠাইয়া লয়। বাকি এক ঘন্টায় শ্রমিক তাহার জন্য মুনাফা সৃষ্টি করে। সুতরাং মালিক তাহার নিজের জন্য শ্রমিককে খাটায় মাত্র এক ঘন্টা। ইহাই সিনিয়রের সুপ্রসিদ্ধ 'Last hour Theory'।

রিকার্ডোর মতবাদের বিকাশ এবং পরিণতি ছাড়া অপর আর কিছুই নয়। ১৮৭২ সনে সেন্টপিটার্সবার্গের 'ইউরোপীয়ান মেসেঞ্জার' মার্কসের বিচাররীতি সম্পর্কে যে বিশদ আলোচনা করেন, মার্কস স্বয়ংই তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। পুঁজিতন্ত্রের অন্তর্গত যে সকল তথ্যাদি এবং বিষয়াদি রহিয়াছে, মার্কস সেগুলির বিশ্লেষণ এবং সমন্বয় দ্বারা তাহাদের পশ্চাতে যে সূত্র রহিয়াছে, তাহা-তো আবিষ্কার করিয়াছেনই ; তাছাড়া বিশেষভাবে তিনি এই সূত্রের বিকাশ এবং পরিণতির ক্রমটিই দেখাইয়াছেন। এই সূত্র আবিষ্কার করিয়া সামাজিক জীবনে তাহার ফলাফলও তিনি দেখাইয়াছেন। কি করিয়া সমাজের এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থায় পরিবর্তন ঘটিতেছে, ইহা দেখানোই মার্কসের চেষ্টা। এখানকার সমাজের অস্তিত্ব যেমন সত্য, তেমনি তাহার গুণাত্মক অবস্থান্তরও অনিবার্য। এই অবশ্যম্ভাবিতা সম্পর্কে ব্যক্তি বিশেষের প্রত্যয় আছে কিনা, সে এই সম্পর্কে সচেতন কতখানি, এইরূপ বিচারের কোন প্রয়োজন হয় না। সমাজ পরিবর্তন ব্যক্তির ইচ্ছা, অভিপ্রায় ও চেতনার অপেক্ষা রাখে না ; বরং ব্যক্তির অভিপ্রায় এবং চেতনার রূপ নির্ধারিত হয় সমাজ এবং সামাজিক পরিবর্তন দ্বারা। সমাজের সম্মুখে ব্যক্তির ইচ্ছা এবং চেতনা এতো ক্ষুদ্র বলিয়াই তাহাকে কখনো সমাজ-পরিবর্তনের এবং সামাজিক অবস্থান্তরের মূলসূত্র ধরা যায় না। মার্কসের গবেষণায় তথ্য তথ্যের সহিত তুলিত হইয়াছে ; আইডিয়া এবং তথ্যের তুলনা করা হয় নাই। একে অন্যের তুলনায় তথ্যগুলি হইবে সমাজ-প্রগতির বিভিন্ন সময়ের এবং বিভিন্ন স্তরের বিষয়। মার্কস বিশেষ রকমে বিচার করিয়াছেন সমাজ-প্রগতির বিভিন্ন স্তরের পরম্পরাগত সম্পর্ক। সমাজের বিভিন্ন স্তর বিভিন্ন সমাজসূত্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। কিন্তু আমাদের সাধারণ ধারণা, অর্থনৈতিক সূত্র সকল দেশের, সকল যুগের ও সকল সময়ের জন্য এক। মার্কসের বস্তুতান্ত্রিক বিচার এই ভ্রান্ত ধারণাকে অস্বীকার করিয়াছে। প্রত্যেকটি ঐতিহাসিক যুগের রহিয়াছে স্বতন্ত্র অর্থনৈতিক সূত্র। সমাজের একটি বিশেষ প্রকারের বিকাশের আর যখন প্রয়োজন থাকে না, তখন সমাজ নতুন সূত্রাধীন হইতে বাধ্য হয়। মার্কস তাঁহার গবেষণায় এই বিচাররীতির অবলম্বন দ্বারা একটি বিশেষ প্রকারের সমাজ-স্তরের উদ্ভব, বিকাশ এবং বিনষ্টি সম্পর্কে যেমন আলোচনা করিয়াছেন, তেমনি ইহার পরবর্তী রূপটির সূত্রও আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন। এই কারণেই মার্কসীয় বিচাররীতি বৈজ্ঞানিক, বাস্তবের সহিত সঙ্গতি-সম্পন্ন।

মার্কসের 'ডায়ালেকটিক' হেগেলের 'ডায়ালেকটিক' হইতে ভিন্ন। উপরোক্ত বিচার ডায়ালেকটিক-সম্মত বিচার। সমাজকে পরিবর্তন সাপেক্ষ ধরিয়া লইয়া সমাজের বিভিন্ন স্তরগুলির পশ্চাদবর্তী সূত্রগুলিকে আবিষ্কার করা এবং ইহাদের পরস্পর সম্পর্ক নির্ধারণ করা সম্পূর্ণভাবে ডায়ালেকটিক রীতিতেই বিচার। মানুষের মননক্রিয়া হইতে উদ্ভূত ধারণা হেগেলের নিকট 'আইডিয়া' নাম লইয়া একটি বস্তু-অনপেক্ষ সত্তা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। হেগেলের মতে এই 'আইডিয়াই' বস্তুর স্রষ্টা ; বাস্তব-বিশ্বটি 'আইডিয়ারই' বাহ্য বিকাশ ভিন্ন অপর আর কিছু নয়। প্রকৃতপক্ষে বাহিরের একটি

বস্তু মস্তিষ্কে স্থানান্তরিত হইলেই তাহাকে বলা হয় 'আইডিয়া'।* ১৮৪২ সালে মার্কস সর্বপ্রথম হেগেলের অতীন্দ্রিয় ব্যাখ্যার সমালোচনা করেন। সে সময়ে জার্মানির চিন্তা জগতে হেগেলের খুব প্রভাব। কিন্তু মার্কস যখন 'কেপিটেল' প্রণয়নে প্রবৃত্ত হন, তখন হেগেলকে 'dead dog' আখ্যা দেওয়া একটি ফাসানের ভিতর পরিগণিত হইল। মার্কস ইহা দেখিয়া প্রকাশ্যভাবেই নিজেকে হেগেলের শিষ্য বলিয়া ঘোষণা করিলেন।

'ডায়ালেটিক' হেগেলের নিকট অতীন্দ্রিয়রূপ পাইলেও, তিনিই সর্বপ্রথম ইহাকে একটি সুনির্দিষ্ট আকার দেন। হেগেলের নিকট ডায়ালেটিক মাথার উপর দাঁড়াইয়া আছে ; মার্কস ইহাকে পায়ের উপর দাঁড় করাইয়া স্বাভাবিক ভঙ্গিতে ফিরাইয়া আনিলেন। হেগেলের ডায়ালেটিকের মূল 'আইডিয়া' ; মার্কসের নিকট তাহা 'বস্তু'। অতীন্দ্রিয়রূপে জার্মানিতে ডায়ালেটিক খুবই আদৃত ছিল ; কেননা চলতি সমাজ ব্যবস্থার ইহা বিরোধী নয়। কিন্তু ডায়ালেটিকের বস্তুতান্ত্রিক রূপ সেখানে অভিশাপ বিশেষ হইয়া দাঁড়াইল। মার্কসের ব্যাখ্যা সকল প্রকার সামাজিক ব্যবস্থাই যে সাময়িক তাহার উপরই জোর দিয়াছে। মার্কসের ডায়োলেকটিক নির্ভীক এবং বৈপ্লবিক ; বর্তমান সমাজকে আক্রমণ করিতে এবং ইহার সমূল ধ্বংস সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করিতে ইহার কিছুই বাঁধে না।

* মানুষ বাহিরের একটি বস্তুকে যখনই প্রত্যক্ষ করে তখন বস্তুটি সম্পর্কে তাহার একটি ধারণা জন্মে। ইহাকে মার্কস বলিয়াছেন — object transferred into the head।

হেগেল ও বিশ্ব ইতিহাস

হেগেল বিশ্ব ইতিহাসের দর্শন রচনা করিয়াছেন। এই আলোচনায়ই তাহার দর্শনের মর্ম সহজে ফুটিয়া উঠিয়াছে। কি করিয়া আত্মা (spirit) সত্যের আলোকে উদ্ভাসিত হয়, তাহা দেখানোই বিশ্ব ইতিহাসের কার্য। বিশ্ব ইতিহাসেই 'প্রজ্ঞার' (reason) উদয় হয় ; ইহারই ভিতরে 'প্রজ্ঞা' তাহার বিকাশ ও স্বতঃস্ফূর্ততার পথ খুঁজিয়া লয় এবং পরিশেষে আত্মোপলব্ধির আনন্দে সার্থক হয়। হেগেল লিখিত ইতিহাস পর্যালোচনায় এই মূল কথাটি মনে রাখিতে হইবে।

ইতিহাসকে দেখা হইয়াছে তিন রকমে (১) মৌলিক ইতিহাস (Original History) (২) ভাবমূলক ইতিহাস (Reflective History) (৩) দার্শনিক ইতিহাস (Philosophical History). হিরোটাস এবং থুসিডিডস্ লিখিয়াছেন প্রথম শ্রেণীর ইতিহাস। তাঁহাদের রচনা সম-সাময়িক তথ্য এবং ঘটনাদি বর্ণনাতেই সীমাবদ্ধ ছিল। তাহারা এমন জিনিস রচনা করিয়াছেন যাহার ভিতরে হয়তো বা তাহাদের নিজেদেরই অংশ ছিল অথবা তাহারা ছিলেন সে সকল ঘটনার প্রত্যক্ষ এবং নিবিষ্ট দর্শক। ঐতিহাসিক ঘটনাটির মর্ম এবং তাহাদের আপন ভাব ও ধারণা যেন অনন্য। দ্বিতীয় শ্রেণীর ইতিহাসে সম-সাময়িক ঘটনার সমাবেশ কম ; বর্তমানকে ডিঙাইয়া সূত্র রচনাই ইহার লক্ষ্য। আরো একভাবে এইরূপ ইতিহাস রচনা সম্ভব। অতীত ইতিহাস হইতে নীতি আহরণ করিয়া বর্তমানে উপযোগী শিক্ষা সংগ্রহ ও ভাবমূলক ইতিহাস চর্চার লক্ষ্য হইতে পারে। এইরূপ ইতিহাসকে আক্রমণ করিয়া হেগেল লিখিয়াছেন, অতীতের ধর্ম ও বর্তমানের প্রতিভার ভিতরে মস্ত পার্থক্য রহিয়াছে। বর্তমানে জীবন এবং স্পন্দনের ভিতরে অতীতের নিস্প্রভ স্মৃতি নিতান্ত বেমানান হইয়া পড়ে। অপর একরূপ ভাবমূলক ইতিহাস আছে ; এইরূপ লেখা সাধারণত তথ্য হইতে বিচ্ছিন্ন। এই শ্রেণীর ইতিহাসের একটি ব্যাপক দৃষ্টি আছে বলিয়াই ইহা দার্শনিক ইতিহাসের পথপ্রদর্শক। এই শ্রেণীর রচনাই 'প্রজ্ঞা'কে সকল ঐতিহাসিক ঘটনার নির্দেশক এবং বিশ্বের নিয়ামকরূপে উপস্থিত করিয়াছে।

বিশ্ব প্রকৃতপক্ষে প্রজ্ঞারই বাহ্য-প্রকাশ ; বিশ্ব ইতিহাস প্রজ্ঞারই জয়যাত্রার ইতিহাস। দার্শনিক ইতিহাস এই সত্যটুকুকেই উদ্‌ঘাটিত করিয়াছে। বিশ্ব-ইতিহাস একটি পরিচিন্তিত ক্রম (rational process)। ইহার মূল সত্য 'আত্মা', ইহাই বিশ্বের অন্তঃস্থিত পরমসত্তা। প্রজ্ঞা অথবা আত্মাসৃজন ক্রিয়ার জন্য সকল সময়ই সম্পূর্ণভাবে আত্মনির্ভর। প্রজ্ঞা প্রজ্ঞার উপরই ভিত্তি করিয়া দাঁড়াইয়া আছে ; প্রজ্ঞার লক্ষ্য এবং পরিণতি প্রজ্ঞা স্বয়ং ; এই লক্ষ্যে পৌঁছিবার জন্য যে শক্তি ইহার পশ্চাতে কাজ

করিতেছে তাহাও প্রজ্ঞাই। বিশ্ব এবং বিশ্বের সকল তথ্যাদির ভিতরে প্রকটিত হইতেছে প্রজ্ঞারই গৌরব এবং মর্যাদা।

এখন বিচার্য আত্মার বিশেষ ধর্মটি কি? আত্মা অথবা প্রজ্ঞা তাহার আপন 'আইডিয়া'কে যথার্থ করিবার জন্য কি উপায় অবলম্বন করিতেছে? কিরূপ সমাজ-কাঠামোর ভিতরে আত্মা তাহার বিকাশের কার্য করিয়া যাইতেছে? হেগেল এই সমাজ-কাঠামোকেই রাষ্ট্র আখ্যা দিয়াছেন।

জড় এবং আত্মা পরস্পর-বিরোধী এবং বিরুদ্ধ স্বভাববিশিষ্ট। জড়ের ধর্ম মাধ্যাকর্ষণ; আত্মার স্বরূপ স্বরাট। জড়ের গড়ন যৌগিক এবং গতি বহির্মুখী। আত্মা আপনার ভিতরেই সিদ্ধ, একত্বের সন্ধানে তাহাকে বাহিরের দিকে যাইতে হয় না। জড়ের ঐকান্তিক চেষ্টা আপন 'আইডিয়া'কে সিদ্ধ করা; কিন্তু কখনো যদি তাহা সম্ভব হইত তবে জড় আত্মাতেই পর্যবসিত হইয়া পড়িত। আত্মা একটি স্ব-পর্যাপ্ত সত্তা বলিয়াই স্বরাট তাহার অতি নিজস্ব। আত্মার স্ব-বোধের (self-conciousness) ভিতরে বিষয় (object) এবং বিষয়ী (subject) দুইই এক হইয়া যায়। আত্মার স্ব-বোধ তাহার নিজের সম্পর্কেই জ্ঞান।

বিশ্ব-ইতিহাসের লক্ষ্য, মানুষ মানুষ হিসাবে স্বাধীন, এই বোধটি। প্রাচ্যদেশীয়রা ধারণা করিয়াছিল মানুষ স্বাধীন ব্যক্তি হিসাবে। ইতিহাসে স্বাধীনতাবোধের ইহা অত্যন্ত অপূর্ণ রূপ। গ্রীক রোমানরা জানিয়াছিল, কতিপয় ব্যক্তিই স্বাধীন। কিন্তু তখনও মানুষ যে মানুষ হিসাবেই স্বাধীন, এই বোধটি জন্মাইতে পারে নাই। মানুষের এই বোধটি জন্মাইয়াছে জার্মানগণের ইতিহাসে। হেগেল স্বাধীনতা বোধের এই তারতম্য দিয়াই ইতিহাসের স্তর নির্ণয় করিয়াছেন।

আত্মার পক্ষে আপন স্বাধীনতা সম্পর্কে জ্ঞানই আধ্যাত্মিকতার শেষ পরিণতি। বিশ্বের ইতিহাস ক্রমাগত এই লক্ষ্য অভিমুখেই ছুটিয়াছে। ইহারই জন্য বিশ্বের পরিসীমার ভিতরে এতো ঘটনা-বিপর্যয়, এতো আবর্তন, বিবর্তন, এতো যুদ্ধ-বিগ্রহ। উপরোক্ত আলোচনায় আত্মা অথবা প্রজ্ঞার কি লক্ষ্য হেগেল তাহাই নির্ধারণ করিয়াছেন, এখন কি উপায়ে এই লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব হয় দার্শনিক হেগেল তাহাই আলোচনা করিবেন।

স্বরাটের আদি অবস্থা একটি অপরিণত 'আইডিয়া'। ইহার বিকাশের জন্য আত্মাকে বাহ্যিক বিষয়াদির উপর নির্ভর করিতে হয়। ইতিহাসের দিকে তাকাইলে প্রথম দৃষ্টিতে আমাদের মনে হয় মানুষের সকল কর্মের মূল উৎস বুঝি তাহার আপন ক্ষুধা, প্রবৃত্তি এবং প্রতিভা; সাধারণত দেখা যায়, মানুষের অনুষ্ঠিত কর্ম এবং আচরণের উপর বুদ্ধি অপেক্ষা প্রবৃত্তিরই প্রভাব অধিক। কত ব্যক্তি, কত জাতি, কত রাষ্ট্র আপন আপন কর্মের পরিণামরূপে দুর্গত এবং বিনষ্ট হইতেছে। এইরূপ অবস্থার জন্য সকলের মনেই প্রশ্ন উঠিতে পারে, এমন কোনো সার্বলৌকিক সূত্র আছে কি যাহার নিকট ব্যক্তির, রাষ্ট্রের এবং সমাজের সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকার সম্ভব হইতেছে।

প্রজ্ঞার স্ব-বোধের সম্ভাবনা যথার্থ হইবার জন্য প্রায়োজন মানুষের কাজ; ইহারই

মধ্য দিয়া এই স্ব-বোধ জন্মিতে পারে। মানুষের কাজের মূল তাহার ক্ষুধা, প্রবৃত্তি প্রভৃতি। সকলেরই বাসনা জন্মিতে পারে, কাজের ভিতর দিয়াই তাহার ইচ্ছা-অভিপ্রায় বাস্তবরূপ গ্রহণ করুক। কর্মের সাফল্য হইতেই হয় ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠা।

এই বিচার হইতে দেখা যায় যে, ঐতিহাসিক প্রগতির জন্য 'আইডিয়া' ও প্রবৃত্তি এই দুইটি জিনিসের প্রয়োজন। এই দুইটি বিশ্ব-ইতিহাসের টানা-পড়েন। বাস্তব জগতে এই দুইটির সম্মিলনকে হেগেল আখ্যা দিয়াছেন লিবার্টি। 'লিবার্টি'র বিকাশ হইতে পারে রাষ্ট্রিক পরিবেশের অন্তর্ভুক্ত নৈতিক আবহাওয়ার ভিতরে। রাষ্ট্রের অন্তর্গত সকল নাগরিকগণের ইচ্ছা-অভিপ্রায় রাষ্ট্রৈষণার (will of the state) সহিত সুসংগত ও একীভূত হইলেই রাষ্ট্র সুদৃঢ় এবং সুগঠিত হইবে। এই সঙ্গতিকে যথার্থ করিয়া তুলিতে হইলে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে বহু রূপান্তর ও বিবর্তনের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। ইতিহাসের বিঘ্ন-সঙ্কুল পথে প্রকৃত রাষ্ট্র কাঠামোর বিকাশের জন্য সংখ্যাতীত সংঘর্ষ অনিবার্য। প্রজ্ঞার সিদ্ধিই যদিও বিশ্ব-ইতিহাসের লক্ষ্য, তবুও ইহার শুরু হয় প্রকৃতিকে দিয়াই। তখন এই উদ্দেশ্য থাকে অবিকশিত নির্জ্ঞানের স্তরে। মানুষের কর্মের মধ্য দিয়াই এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়; কর্মের মূল প্রবৃত্তি।

একটি অট্টালিকা নির্মাণ করিতে হইলে ইহার সম্পর্কে ধারণা এবং ইহার একটি পরিকল্পনা পূর্ব হইতেই মস্তিষ্কে থাকিবে। অট্টালিকা নির্মাণের জন্য যে সকল মালমশলা প্রয়োজন তাহাও সম্মুখে উপস্থিত রাখিতে হইবে। একদিকে লোহা-লক্কড়, কাঠ-পাথর প্রভৃতি কাঁচামাল এবং অপরদিকে জল, বায়ু, আগুন প্রভৃতি প্রাকৃতিক উপাদান এ সকলেরই প্রয়োজন। বায়ু অট্টালিকা নির্মাণে সাহায্য করিবে সত্য কিন্তু অট্টালিকা খাড়া হইলে তাহা দ্বারা বায়ুকেই ঠেকাইয়া রাখা হইবে। নির্মাণ কার্যে জলের আবশ্যক, আগুনের প্রয়োজন, কিন্তু পরিকল্পনাটি যখন রূপ লইবে, তখন জল, আগুন প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিষয়গুলিকে বাঁধা দেওয়া এবং ঠেকাইয়া রাখাই হবে অট্টালিকার কাজ। প্রাকৃতিক উপাদানগুলি তাহাদের স্ব-স্ব-ধর্ম পালন করিয়া গেল তাহাদের স্বভাব-অনুযায়ীই তাহাদিগকে কাজে লাগানো হইল; কিন্তু পরিকল্পনাটি সফলতার পথে অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের স্বভাব ধর্মের খর্ব এবং সঙ্কোচন হইয়া পড়িল। সমাজের ব্যাপারে দেখা যায়, কোনো একটি বিষয়ে ব্যক্তিগত অভিপ্রায়ের চরিতার্থতা ঘটিলেও বহুলোকের পরিতৃপ্তির প্রয়াস হইতে এইরূপ জিনিসের সৃষ্টি হয় যে তাহা দ্বারা ব্যক্তিগত প্রবৃত্তির সঙ্কোচন হইয়া আত্মপ্রকাশ করে সমাজ-শৃঙ্খলা এবং সার্বজনীন রাষ্ট্রাধিকার।

ইতিহাসে দেখা যায়, মানুষ তাহার একটি কাজ দ্বারা যে ইচ্ছা চরিতার্থ করিতে চাহিয়াছে, তাহা হইতে অপর একটি উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইতেছে। ব্যক্তি হয়তো বা মোটেই তাহা ইচ্ছা করে নাই, কিন্তু তবুও তাহা সত্য হইয়া উঠিতেছে। এক ব্যক্তি তাহার বিশেষ একটি অভিসন্ধি চরিতার্থ করিবার জন্য কোনো একজনের ঘরে আগুন লাগাইয়াছে; তাহা হইতে হয়তো বা বহুজনের ঘরবাড়ি, ধনপ্রাণ বিনষ্ট হইয়াছে।

একটি নিতান্তই একক ঘটনার সংগঠন হইতে ব্যাপক একটি ব্যাপারের সৃষ্টি হইল, ক্ষুদ্র বৃহৎ-এর সঙ্গে সংযুক্ত হইল ; এক এবং বহু'র ভিতরে যোগসূত্র স্থাপিত হইল। বিশ্ব-ইতিহাসে যে সকল ঐতিহাসিক ব্যক্তির স্থান অক্ষয় হইয়া রহিয়াছে, তাহাদের জীবনে দেখা যায় তাহাদের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যের মধ্যে অপর একটি বৃহৎ উদ্দেশ্য লুক্কায়িত রহিয়াছে।

সিজার নিজের গৌরব ও মর্যাদার জন্য রোম-সাম্রাজ্য করায়ত্ত করিলেন ; নিজে স্বেচ্ছাচারী সাজিলেন ; এই ব্যাপারে তাহার ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল বটে, — কিন্তু ইহাকে সংগঠিত করিল একটি অননুভূত প্রেরণা। এই প্রেরণা ঠিক এই মুহূর্তটিরই অপেক্ষায় ছিল। ঐতিহাসিক ব্যক্তিমাত্রেরই কাজের ভিতর দিয়া 'বিশ্ব-আত্মা' তাহার আপন কাজ করিয়া লইতেছে। ইহারা ইতিহাসের নায়ক, কেন না জীবনের গড্ডালিকায় ইহার ভাসিয়া যায় নাই ; নির্ঝঞ্ঝাট শান্তিময় জীবনের কামনা ইহারা করে নাই। বর্তমানের তলদেশে প্রচ্ছাদিত বিশ্ব-আত্মারূপ উৎস হইতে ইহারা প্রেরণা লাভ করিয়াছে। এই ঐতিহাসিক ব্যক্তিরা ধারণাই করিতে পারে না যে ইহাদের বিশেষ বিশেষ কাজের ভিতর দিয়া বিশ্ব-আত্মাই প্রকটিত হইতেছে। আলেকজান্দার, সিজার, নেপোলিয়ন সমাজের শ্রেষ্ঠ লোক, কেন না তাহারা বৃহৎ কাজ সম্পন্ন করিয়াছেন, যুগোপযোগী কর্তব্য সম্পাদন করিয়াছেন। প্রবৃত্তির প্রেরণায় যে কাজ হয় বিশ্ব-আত্মা তাহার মধ্য দিয়াই আপন কাজ করিয়া লইতেছে। ইতিহাসে নানা আবর্তন, নানা সংঘর্ষ আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি ; ইহাদের মধ্য দিয়া প্রজ্ঞার জয়যাত্রা সম্ভব হইলেও বিশ্ব-আত্মা কখনো ইহাদের ভিতরে লিপ্ত হইয়া পড়ে না ; তাহার নিরাপত্তা সুনিশ্চিত।

হেগেল এখন বিচার করিবেন কি রকম ক্ষেত্রে আত্মা মানুষের অভিপ্রায় এবং আদর্শের ভিতর দিয়া আপন প্রকাশের কার্য করিয়া যাইতেছে। সাধারণভাবে আমরা বুঝি মানুষের আপন ব্যক্তিত্বই এই ক্ষেত্র। কিন্তু ব্যক্তিত্বের একটি বাস্তব ভিত্তি থাকা প্রয়োজন। এই ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত থাকিয়াই ব্যক্তিত্ব আত্মার রাজ্যের অংশীদার হইতেছে। রাষ্ট্রিক আবেষ্টনীর ভিতরই শুধু ব্যক্তি প্রকৃত স্বাধীনতার অধিকারী হইতে পারে। রাষ্ট্র মানুষের নৈতিক জীবনেরই একটি পরিপূর্ণ রূপ। যে সকল জাতি বিশ্ব-ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করিয়াছে, তাহারাই শুধু রাষ্ট্র গঠন কার্যে সমর্থ হইয়াছে।

ইতিহাসের নিরন্তর রূপান্তর ইহাই নির্দেশিত করে যে ইতিহাসের গতি উত্তরোত্তর সম্পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতেছে। প্রকৃতির ভিতরে বৈচিত্র্য থাকিলেও সেখানে পরিলক্ষিত হয় একই জিনিসের পুনরাবর্তন। প্রকৃতির রাজ্যে নূতনত্ব কিছুই নাই। আত্মার রাজ্যেই এই নূতনত্ব সংগঠিত হইতেছে। প্রাকৃতিক বিষয়াদির বিকাশ হয় অনায়াসে এবং বাধাশূন্যভাবে, কিন্তু আত্মার রাজ্যে বিকাশ কখনো সহজে এবং নির্বিরোধে সম্ভব নয়। আত্মা নিজের সহিতই নিজে সংগ্রামরত ; আত্মার শ্রেষ্ঠ অন্তরায় আত্মা স্বয়ং ; আত্মার গৌরব এই অন্তরায়কে অতিক্রম করার ভিতরে।

প্রকৃতির ভিতরে বিকাশ আয়াসসাধ্য না হইলেও, আত্মার রাজ্যে তাহা সংগ্রাম-সাপেক্ষ। প্রকৃতির রাজ্যে বিকাশ বিকাশেরই জন্য। কিন্তু আত্মার রাজ্যে বিকাশের লক্ষ্য আত্মারই সম্পূর্ণতা। ইতিহাসের আদি অপরিপূর্ণ ; কেননা এই স্তরে প্রকৃতির প্রভাব মানুষের উপরে অনেকখানি থাকে। ইতিহাসের পরবর্তী স্তরে আত্মা চেতনার অবস্থায় আসিয়া দাঁড়ায়। ইতিহাসের আদি অবস্থার অপূর্ণতার ভিতরেও পরিপূর্ণতার সম্ভাবনা থাকিয়া যায়। এই দুয়ের নিরন্তর সংঘর্ষ এবং ইহাদের দ্বন্দ্বের নিরসন হইতে নতুন অবস্থার উদ্ভব হইতেছে।

'আইডিয়া'র ডায়ালেকটিক প্রকৃতিটি কি ? ক্রমাগত ইহা নতুন নতুন রূপ পরিগ্রহ করিয়া অগ্রসর হয়। পূর্বতন অবস্থাকে অতিক্রম করিয়াই 'আইডিয়া' একটি সত্যকার স্থিতি লাভ করিয়াছে। এই স্থিতিটি পূর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধতর এবং অধিকতর বাস্তব।

ইতিহাসকে বলা যাইতে পারে, কালের বুকে আত্মার বিকাশ ; প্রকৃতিকে বলা যাইতে পারে দেশের (space) উপরে আত্মার অভিব্যক্তি। প্রথমটিতে আমরা দেখিতে পাই, — জাতির, রাষ্ট্রের এবং অতীত কীর্তির উত্থান এবং পতন। কার্থেজ অথবা রোমের ভগ্নাবশেষের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আমরা দুঃখে অভিভূত হইতে পারি ; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অপর একটি ভাবও জন্মে — পুরাতনের সমাধি হইতে নবতম জীবনের উন্মেষ হইবেই।

ইতিহাসের প্রগতি আত্মাকে আত্মাতেই ফিরাইয়া আনে। বীজের সহিত ইহার তুলনা হইতে পারে বৃক্ষের শুরু বীজ হইতে ; কিন্তু বীজই আবার ইহার সমগ্র জীবনের ফল। জাতির জীবনে কোনো একটি ঘটনা ঘটিলেও পরক্ষণেই তাহা বিষ হইয়া ওঠে। এই বিষয়কে পরিহার করা, সরাইয়া দেওয়া সম্ভব নয় ; কেন না ইহারই জন্য যে তাহার তৃষ্ণা। বিষ গ্রহণ করিয়া সে তাহার বিনষ্টিকে ডাকিয়া আনে ; এই বিনষ্টি হইতেই আবার উন্মেষ হয় নবতম জীবনের।

আত্মার নিকট অতীত বলিয়া কিছুই নাই, চিরন্তন বর্তমানই তাহার কর্মক্ষেত্র।

ভাববাদী দর্শন ও ডায়ালেকটিক

আঠারো শতকের বস্তুবাদের পরে জার্মানিতে জন্ম লইল ভাববাদ ইহাকে সাধারণত বলা হয় স্পেকুলেটিভ ফিলসফি। হেগেল এই দর্শনের জন্মদাতা। বস্তুবাদী অপেক্ষা ভাববাদীদের বিচার পদ্ধতি উন্নততর ছিল। বস্তুবাদীরা সকল বস্তুকেই মনে করিত অপরিবর্তনীয়। এই শ্রেণীর দার্শনিকেরা বস্তুর পরিবর্তনকে স্বীকার না করিয়াই তত্ত্ব-নির্মাণ করিত। কিন্তু যে ভাববাদের কথা আমরা উল্লেখ করিলাম তাহা বস্তু এবং তথ্যকে বিচার করিল অন্যদৃষ্টিতে। ভাববাদীরা তাহাদের বিচারে লক্ষ্য রাখিত বস্তুর উদ্ভব, বিকাশ এবং বিনাশের দিকে। বস্তুবাদী দার্শনিকেরা সকল জিনিসকেই ভাবিত অজড়, অনড়, সকল জিনিসেরই যে রূপান্তরের সম্ভাবনা থাকিতে পারে তাহা ইহারা বুঝিয়া উঠিতে পারিত না। বস্তুবাদীদের এই দৃষ্টিভঙ্গি এবং বিচাররীতি সম্পূর্ণভাবে পরিহার করিলেন ঊনবিংশ শতকের শ্রেষ্ঠ ভাববাদী দার্শনিক হেগেল। হেগেল ইহার বিরুদ্ধে দাঁড় করাইলেন ডায়ালেকটিক বিচাররীতি।

হেগেল নিজেই বলিয়াছেন, ডায়ালেকটিক সম্পর্কে সাধারণের ধারণা ইহা বুঝি যুক্তিতর্কের একটি কৌশল মাত্র। প্রকৃতপক্ষে ডায়ালেকটিক বিশ্বের এবং বিশ্ব ইতিহাসের অন্তর্নিহিত একটি মূলসূত্র। আমাদের চারিদিককার যে কোনও বিষয় অথবা ঘটনাই ডায়ালেকটিকের দৃষ্টান্তস্বরূপে কাজ করিতে পারে। গ্রহটি এই মুহূর্তে এই জায়গায় ; কিন্তু পরমূহূর্তেই স্থানচ্যুত হইয়া ইহার একটা অবস্থান্তর সংগঠিত হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। নৈতিক বিষয়ে দেখা যায়, আমি হয়তো বা মনে করলাম একটি সৎকাজ করিয়াছি ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমার এই কাজের ফলস্বরূপ জন্মিয়াছে মস্ত একটি অনিষ্ট।

বস্তুবাদীদের চিন্তারীতিকে মেটাফিজিকেল এবং ভাববাদীদের বিচার পদ্ধতিকে ডায়লেকটিকেল আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। প্রাথমিক গণিতের (lower mathematics) সহিত উচ্চতম গণিতের (higher mathematics) যে প্রভেদ, উপরোক্ত দুইটি চিন্তারীতির ভিতরেও রহিয়াছে অনুরূপ পার্থক্য। নিম্নতম গণিতের ভিতরে বিষয়গুলি একে অন্য হইতে পৃথক। বৃত্ত একটি বৃত্তই ; বহুভুজ একটি বহুভুজই ; ইহাদের অপর কোনো কিছুতে পরিবর্তিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকিতে পারে না। কিন্তু জ্যামিতিতে আমরা দেখিতে পাই যে একটি বহুভুজকে বৃত্তে পরিবর্তিত করা যাইতে পারে। গাণিতিক সংজ্ঞা এবং সূত্রগুলির ভিতরে ইহাকে মস্ত একটি বিপ্লব আখ্যা দেওয়া যায়। এই বিপ্লবটিই গণিতের উচ্চতর বিশ্লেষণের শুরু।

ডিফারেনসিয়াল কেলকুলাস্ সম্পর্কে হেগেল বলিয়াছেন, এতো ক্ষুদ্র রাশি লইয়া

এই গণিতের কাজ যে মনে হয়, রাশিগুলি বুঝি একেবারেই নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে। নিঃশেষিত হইবার পূর্বেও নয় আবার পরেও নয় এই অবস্থাটিতেই কেলকুলাস তাহার গণনাকার্য করে। হেগেল ঘোষণা করিলেন, এমন কোনো বিষয় নাই, যাহার অবস্থান্তর হয় না ; যাহারা নাকি অস্তিত্ব এবং অনস্তিত্বের মধ্যবর্তী কোনো অবস্থা নাই।

ভূবিদ্যার ভিতরে যতদিন ধারণা ছিল যে হঠাৎ একটি বিপর্যয় অথবা প্রলয় অপ্রত্যাশিতভাবে সংগঠিত হইয়া সকল কিছুর চেহারা বদলাইয়া দেয়, ততদিন তাহাতে মেটাফিজিকেল চিন্তারীতিরই প্রাধান্য ছিল। কিন্তু যখন বোধ জন্মাইল যে ভূপটল ধীরে ধীরে বিকাশ লাভ করিয়া কোন একটি মুহূর্তে সম্পূর্ণ রূপান্তরিত হয়, তখনই ভূবিদ্যা ডায়ালেকটিক বিচাররীতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। জীববিদ্যা সম্পর্কে ধারণা ছিল, জাতি (species) অপরিবর্তনীয়। ইহা মেটাফিজিকেল ধারণা। ফরাসী বস্তুবাদী দার্শনিকেরা এই ভাবেই ভাবিত। নব্য জীববিদ্যা এই ধারণাটিকে সম্পূর্ণরূপে পরিহার করিয়াছে। ডারউইনের নামে যে বিবর্তনতত্ত্ব প্রচারিত হইয়াছে, তাহা পুরোপুরি ডায়ালেকটিক বিচার প্রসূত।

বিশ্বের সকল ব্যাপারে বিকাশের এই ধারাটি স্বীকৃতি হইল বটে, কিন্তু গোল বাঁধিয়া গেল একটি প্রশ্নে, রূপান্তর কি ধীরে ধীরেই হয়, না ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া একটি বিশেষ অবস্থায় পূর্ব হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন নতুন একটি জিনিসের সৃষ্টি হয়। যাহারা বৈপ্লবিক পরিবর্তনকে স্বীকার করেন না তাহারা জোর দিলেন ঘটনার সংখ্যাত্মক (quantitative) বিকাশ এবং পরিবর্তনের উপর। একটি বিশেষ মুহূর্তে যে ঘটনার অবস্থান্তর ঘটে তাহার প্রতি ইহারা লক্ষ্য করিলেন না। ইহাদের মতে, nature makes no leap এইভাবে যাহারা চিন্তা করেন, তাহাদের নিকট কি করিয়া একটি ঘটনা সম্পূর্ণ নতুন ঘটনায় রূপান্তরিত হয়, তাহা সমস্যাই রহিয়া গেল। সংখ্যাত্মক বিকাশ হইতে গুণাত্মক পরিবর্তনের সম্ভাবনা বুঝিতে না পারায় ইহাদের চিন্তা এবং বিচার মেটাফিজিকেল স্তরেই রহিয়া গিয়াছে। এই শ্রেণীর চিন্তাশীলদের মতে শুধু প্রকৃতিতেই নয়, ইতিহাসে বৈপ্লবিক বিবর্তন বলিয়া কোনো জিনিস নাই। পক্ষান্তরে ইতিহাসে বহুবিধ বিপ্লব ঘটিয়াছে ; কিন্তু ইহাদের চিন্তার ভিতরে পরিবর্তন সহজে আসিতে পারে নাই। জলকে আমরা ক্রমেই অধিকতর শীতল করিতে পারি, কিন্তু জল বরফে পরিণত হয় বিশেষ পরিমাণের একটি শৈত্যের অবস্থায় ; ধীরে ধীরে জল কখনো শক্ত হইতে থাকে না। যতক্ষণ না জল বরফে পরিণত হয়, ততক্ষণ তাহার শৈত্যের পরিমাণে সংখ্যাত্মক পরিবর্তন ঘটিয়াছে সত্য ; কিন্তু কোনওরকম গুণাত্মক পরিবর্তন ঘটিতেছে না।

সামাজিক ঘটনায় ডায়ালেকটিক বিচার রীতির প্রয়োগ বিশেষভাবে কার্যকরী হইয়াছে। অত্যুক্তি না করিয়াও বলা যাইতে পারে যে মানুষের ইতিহাসকে সূত্র ও নিয়মের প্রভাবাধীন দেখিতে এবং সুবিন্যস্ত আকারে বুঝিতে আমরা সমর্থ হইয়াছি ডায়ালেকটিক বিচার রীতির প্রয়োগদ্বারা। বস্তুতন্ত্রী দার্শনিকেরা সামাজিক ঘটনাদির

কারণ নির্ণয় করিতে গিয়া নির্ভর করিত কতিপয় লোকের চিন্তা, ইচ্ছা এবং চেতনার উপরে, যেন সমাজের সকল কিছুই ইহাদের চিন্তা হইতে উদ্ভূত হয়। কিন্তু ডায়ালেকটিক-ভাববাদে সমাজ তথ্যাদির ভিতরে আকস্মিকতার (chance) স্থলে অবশ্যম্ভাবিতাকে (necessity) এবং কার্যকারণ সম্পর্ককে স্বীকার করিয়াছে। এইরূপ দৃষ্টি না থাকিলে প্রকৃতি এবং সমাজের ভিতরে আমরা দেখিব শুধুই অরাজকতার রাজত্ব।

সেলিং (schelling) একজন শ্রেষ্ঠ ভাববাদী। তিনি বলিয়াছেন, ইতিহাসে দেখা যায় মানুষের স্বাধীন-ইচ্ছা অবশ্যম্ভাবিতার সূত্র মানিয়া চলিতেছে, আবার এই অবশ্যম্ভাবিতাই পরিণত হইতেছে স্বাধীনতায় এইরূপ ধারণা কি বস্তুতন্ত্রীদের ধারণা হইতে উচ্চতর নয়? সেলিং-এর মনে প্রশ্ন উঠিল মানুষ যদি সম্পূর্ণ স্বাধীনই হইবে অথবা সচেতন থাকিবে, তবে এরূপ বিষয় কি করিয়া সম্ভব হয় যাহা আমরা ইচ্ছাও করি না, চিন্তায়ও আনি না? হেগেলের নিকট বিশ্ব-ইতিহাস স্বাধীনতা-বোধের বিকাশ ছাড়া অপর আর কিছু নয়; কিন্তু এই বিকাশকে অবশ্যম্ভাবিতার সূত্র মানিয়াই অগ্রসর হইতে হয়। সেলিং-এর মতন হেগেলও ভাবিলেন, মানুষ যাহা ভাবে তাঁহার বিপরীত ঘটে; অথবা তাহার আপন স্বার্থ-অনুযায়ী যে কাজ সে করে তাহা হইতে অ-ভাবিত অথবা অনভিপ্রেত ফল জন্মে।

মেটাফিজিকেল চিন্তারীতির সাহায্যে যাহারা বিচার করেন তাহার ঘটনাদির পরিবর্তন ও রূপান্তর লক্ষ্য করিতে পারেন না; সকল বিষয়কেই অজড় অনড় ভাবিয়া নেন। যখনই তাহারা ঘটনানুক্রম (continnum) অথবা ঘটনা পারম্পর্যের সন্মুখীন হন, তখন তাহাদের হয় মুসকিল। ঘটনাটিকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখাই তাহাদের অভ্যাস; তাই দুইটি ঘটনার ভিতরে তাহারা দেখেন অনতিক্রম্য ব্যবধান। ডায়ালেকটিক রীতিতে যাহাদের চিন্তা পরিচালিত হয় তাহারা বিশ্বের কোনো তথ্যকেই বিচ্ছিন্ন দেখেন না। সচল ঘটনাই একটি সমগ্রের অংশ, সুতরাং পরস্পর সংগ্রথিত। মেটাফিজিকেল চিন্তা ঘটনা-পারম্পর্য বিশ্লেষণ করিতে গিয়া আশ্রয় নেয় পারস্পরিকতার সম্পর্কের (reciprocity)। শিক্ষা পরিবেশকে প্রভাবান্বিত করে, পরিবেশ শিক্ষাকে প্রভাবান্বিত করে; এইরূপ চিন্তার বেশি তাহারা যেমন অগ্রসর হইতে পারেন না, তেমনি তলাইয়াও দেখিতে চান না। ডায়ালেকটিক ভাববাদ বলিবে, কোন একটি বিশেষ সামাজিক অবস্থায় শিক্ষা এবং পরিবেশ দুইই তৃতীয় একটি কারণ বিশেষের 'কার্য।' হেগেল স্পার্টার শাসনতন্ত্রের কারণ নির্ণয় করিতে গিয়া নিম্নোক্তরূপ বলিয়াছেন। স্পার্টানদের আচার-ব্যবহারকে স্পার্টান শাসন-কাঠামোর কারণ বলা এবং অপরপক্ষে স্পার্টার শাসন-কাঠামোকেও স্পার্টানদের আচার ব্যবহারের কারণ উল্লেখ করা এক পক্ষে সত্য হইতে পারে। কিন্তু যেহেতু এই দুইটি সম্পর্কেই আমাদের পরিষ্কার এবং যথার্থ ধারণা হয় নাই, সুতরাং এই ধরনের চিন্তার ফলাফল কখনো কার্যকরী হইতে পারে না। আমাদের বিচার যথাযথ হইবে, যখন আমরা স্পার্টাস জীবনের এই বিশেষ বিশেষ দিকগুলিকে সমগ্রের অংশরূপে বুঝিতে পারিব। ফরাসী বস্তুবাদী দার্শনিকেরা

মধ্যযুগকে ঘৃণার চোখে ছাড়া অন্য কোনওভাবে দেখেন নাই। হেলভেসিয়াস্ মধ্যযুগের ফিউদতন্ত্রকে মনুষ্যের নির্বুদ্ধিতার চূড়ান্ত নিদর্শনরূপে আখ্যাত করিয়াছেন। হেগেল মধ্যযুগের ফিউদতন্ত্রকে মনুষ্যের নির্বুদ্ধিতার চূড়ান্ত নিদর্শনরূপে আখ্যাত করিয়াছেন। হেগেল মধ্যযুগের প্রতি কোনওরকম প্রীতি প্রকাশ করেন নাই সত্য, কিন্তু মানবতার বিকাশের পথে মধ্য যুগ যে একটি অনিবার্য স্তর তাহাও বলিতে ভুলেন নাই। ফিউদতন্ত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব হইতেই যে নব যুগের জন্ম হইয়াছে তাহা স্পষ্টত তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। হেগেলের ডায়ালেকটিক-বিচারের একটি বিশেষত্ব এই যে হেগেল দর্শন পূর্বগামী দর্শনগুলিকে ঘৃণার চোখে দেখিয়া বিরুদ্ধাবাদ করিবার প্রয়োজনবোধ করে নাই। দার্শনিক বিকাশের পথে বিভিন্ন মনীষিদের আবিষ্কৃত বিভিন্ন তত্ত্ব বিশেষ বিশেষ স্তর মাত্র। প্রত্যেক দর্শনের উপরে রহিয়াছে যুগ-বৈশিষ্ট্য এবং লক্ষণের ছাপ। যুগ ধর্মকে ও যুগ বিশেষের ভাবাদর্শকে অতিক্রম করিয়া দর্শন রচনা সম্ভব নয়। হেগেল আরো বলিয়াছেন যে, কোনও দর্শনের ভিতরেই তাহার পরবর্তী দর্শনগুলির বিষয় এবং শিক্ষা সন্নিবেশিত হইতে হইবে।

অনেক দার্শনিককেই দেখা যায়, তাহাদের দর্শন-আলোচনার ভিতরে তাহারা আপন আপন ধারণা-অনুযায়ী একটি করিয়া 'utopia' রচনা করিয়া থাকেন। এদেশের রাষ্ট্রনীতিতে ইহাই 'রামরাজত্ব' আখ্যা পাইয়াছে। ডায়ালেকটিক ভাববাদ 'রামরাজত্বের' পরিকল্পনা তৈয়ারির বিরোধী। হেগেলের মতে রাষ্ট্র একটি 'সমগ্র' এবং 'সমষ্টি'। এইরূপ সত্তার অন্তর্বর্তী কোনো বিষয়কে আমরা পৃথক করিয়া আনিতে পারি না। তাই সমাজ জীবনের অন্যান্য বিষয়কে ঠেলিয়া দিয়া রাষ্ট্র-গঠন সম্পর্কে স্বতন্ত্র কল্পনা অসত্য। কোন্ সময়ে কি অবস্থায় কি প্রকারের রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিবে তাহা নির্ভর করিবে জাতীয় সমষ্টিগত সমগ্র জীবন কি অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে তাহার উপর।

'সমগ্র' সত্তাটি কি সূত্রদ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তাহা আবিষ্কার করাই ডায়ালেকটিক ভাববাদের প্রচেষ্টা। কিন্তু হেগেল দর্শনের এই চেষ্টা কি সফল হইয়াছে? এই দর্শনটি মানুষের চিন্তাকে সংশয় ও অস্পষ্টতা হইতে অনেকখানি মুক্ত করিয়াছে বটে, কিন্তু মানুষের জ্ঞান-ভাণ্ডারের এতটুকু সঞ্চয় রাখিয়াই এই দর্শন নিঃশেষিত হইয়াছে। হেগেল নিজেই বলিয়াছেন সকল সসীম (finite) বস্তুই নিজের নিরসনকে ডাকিয়া আনিয়া বিপরীত-রূপ গ্রহণ করে। হেগেলের এই উক্তির সত্যতা প্রমাণের জন্যই কি হেগেলীয়-দর্শনের মৃত্যু ঘটিল! হেগেলের মৃত্যুর দশ বছর পরই বস্তুতন্ত্র নতুনরূপে প্রকটিত হইয়া বিশ্ব-ইতিহাসের যথার্থ মূলসূত্রটি আবিষ্কারের প্রচেষ্টায় জয়যুক্ত হইল।

সামান্য একটু বস্তুনিষ্ঠ চিন্তার সন্মুখে হেগেলের চরম-প্রজ্ঞা (absoulute Reason) নিস্প্রভ ও ম্রিয়মান হইয়া উঠে। এইরূপ প্রজ্ঞা সম্পূর্ণ বিয়োজন (abstraction) ছাড়া অন্য কোনরূপে প্রতিভাত হয় না, প্রকৃতি এবং ইতিহাসের তথ্যাদির অর্থ-প্রকাশে অপারগ হইয়া তখন ইহা নিজের অর্থ-বিচারেরই দাবি করে অন্য সূত্রের নিকট।

সহজ কথায়, আমরা যে পদ্ধতিতে চিন্তা এবং বিচার করি হেগেলের নিকট তাহাই

মূর্তি লইয়া 'চরম প্রজ্ঞা' আখ্যা পাইয়াছে। বিশ্বের এবং সমাজের অর্থ-বিচারের জন্য যাহারাই হেগেল-কথিত চরম-প্রজ্ঞার শরণাপন্ন হয় তাহারা বস্তুর জগত ছাড়াইয়া অলীক ছায়াকেই আঁকড়াইয়া থাকে। জার্মানির ভাববাদীরা তাহাই করিয়াছিলেন।

মার্কস-এঙ্গেলস হেগেলের চরমপ্রজ্ঞা সম্পর্কে নিম্নোক্তরূপ সমালোচনা করিয়াছেন। ধরা যাউক, তিনটি বিভিন্ন ফল, আম, লিচু, আতা। ইহারা বিভিন্ন হইলেও, ইহাদের ভিতরে বিশিষ্ট একটি ধর্মের সমরূপতা রহিয়াছে। এই সারূপ্যের জন্য এই তিনটিকে একটি জাতিতে পরিণত করিয়া ইহাদের সাধারণ আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে 'ফল'। স্মরণ রাখিতে হইবে, আম, লিচু এবং আতাই যথার্থ সত্তাবিশিষ্ট ; ফল মাত্র মানুষের চিন্তা প্রসূত একটি ধারণা। ভাববাদী বলিবে ফলই যথার্থ সত্তা-বিশিষ্ট এবং আম, লিচু আতার সারভূত। আম, লিচু-আতার পক্ষে তাহাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাস্তব-অস্তিত্বের কোন মূল্য নাই ; ইহাদের প্রকৃতমূল্য আমাদের কল্পনা-প্রসূত ফলটির ভিতরে। এই ফলেরই বিভিন্ন রূপ বিশেষ বিশেষ ফলগুলি। পৃথক পৃথক ফলগুলির বিভিন্নতা থাকিলেও ভাববাদী বুদ্ধির নিকট তাহা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর এবং উপেক্ষণীয় ; ভাববাদীর নিকট দ্রষ্টব্য ইহাদের অভেদ এবং একত্ব। ভাববাদী আমের ভিতরে যে উপাদান দেখে লিচু-আতার ভিতরেও তাহাই দেখে। আমাদের ইন্দ্রিয়ের সম্মুখে যেগুলি যথার্থ ফলরূপে বর্তমান, ভাববাদীর নিকট সেগুলি মাত্র আসল সত্তার বাহ্য-রূপ।

স্পেকুলেটিভ ফিলসফি আরো বলিয়াছে চরমসত্তা সত্য বটে ; কিন্তু চরমসত্তারূপেই ইহা সমুদয় সত্যটুকু নয় ; ইহা যেমন স্বয়ম্ভূত, তেমনি ইহা যে আপনা হইতেই সক্রিয় এবং সজীব এইভাবে চরমসত্তাকে বুঝিতে হইবে। এখন প্রশ্ন উঠিবে, আম-লিচু-আতা যদি সত্য সত্যই ফলরূপ আসল সত্তাটি হয়, তবে কি করিয়া ইহা এক সময়ে আম, এক সময়ে লিচু এবং অন্য সময়ে আতারূপে প্রকটিত হইল ? স্পেকুলেটিভ-দর্শনের নিকট অভেদ এবং একত্বই সত্য ; তবে এই বৈচিত্র্য সম্ভব হইল কিসে ? ভাববাদীর উত্তর অতি সহজ। ফলরূপ আসল সত্তাটি কখনো নির্জীব নয় ; ইহা যেমন সক্রিয়, তেমনি বিচিত্র ধর্ম-বিশিষ্ট। বিভিন্ন ফলগুলি আসল সত্তার নিকৃষ্টরূপ, বিভিন্ন অবয়ব মাত্র। ইহা একসময়ে গ্রহণ করিয়াছে আমের রূপ, অপর সময়ে হইয়াছে আতা।

মার্কস-এঙ্গেলস এইরূপ যুক্তি সম্পর্কে বলিয়াছেন,—খ্রীষ্টধর্ম জানে ঈশ্বরের অবতার একজন ; কিন্তু স্পেকুলেটিভ ফিলসফির নিকট যতগুলি বস্তু ততগুলি অবতার। হেগেল বলিয়াছেন, real is rational; যাহা প্রজ্ঞা-সম্মত তাহাই সত্য। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যাহাই অস্তিত্ব যুক্ত এবং বাস্তব তাহাই যথার্থ। বস্তুকে, বিষয়কে— স্পষ্টভাবে ধারণা করিবার জন্যই মানুষ অর্থ-বিচার করে এবং বিয়োজনরীতির প্রয়োগদ্বারা একজাতীয় বিভিন্ন বস্তুর সারূপ্য নির্ণয় করে। হেগেল নিজেই বলিয়াছেন, মানুষের চিন্তা কাজ করে, sensuous to sensible পর্যন্ত ; অথচ এই প্রক্রিয়ার শেষ ফলটুকুকে তিনি

আসলসত্তারূপে দাঁড় করাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। বিয়োজনমূলক চিন্তার অর্থই হইল বস্তুকে ভালো করিয়া বুঝিয়া লওয়া। আসল সত্তাকে খুঁজিয়া বাহির করা নয়।

হেগেলপন্থী ভাববাদীরা মনে করেন, বিজ্ঞানের গভীর সমস্যাগুলির নিরাকরণ সম্ভব হইতে পারে একমাত্র প্রজ্ঞা অথবা আত্মার (spirit) সাহায্য লইয়া, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞানের রাজ্যে প্রজ্ঞার প্রক্ষেপ সম্পূর্ণই নিরর্থক। দার্শনিক সেলিং প্রাকৃতিক-বিজ্ঞানগুলি সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন ছিলেন। কিন্তু তথাপি তাহার নিকট এই বাস্তব বিশ্বটি 'আইডিয়ার' প্রকাশ ভিন্ন অন্য কিছুই ছিল না। তিনি বলিলেন মেগনিটিজম একটি সাধারণ অনুপ্রেরণার কার্য (a general act of inspiration), ইহা বহুর ভিতর একের প্রবেশ ; বৈচিত্র্যের জগতে প্রজ্ঞার প্রকাশ ; বিষয়টির (subject) বিষয়ে (object) পরিণতি। হয়তো বা এইরূপ বলায় স্ব-বিরোধী উক্তি কিছুই নাই কিন্তু ইহা কি কিছুমাত্র মেগনিটিজম তত্ত্বটিকে বুঝিবার পক্ষে বিন্দুমাত্র সুবিধা করিয়া দিতে পারিয়াছে ? এই ধরনের যুক্তি আমাদের চিন্তাকে সত্যের দিকে কিছুমাত্র অগ্রসর করিয়া তো দিতে পারেই না, বরং আমাদের মনে বাস্তব সত্য সম্পর্কে সংশয় এবং সন্দিগ্ধতাই জন্মায়।

মনুষ্য সমাজের ঐতিহাসিক বিকাশের উপরে ভৌগোলিক প্রভাব সম্বন্ধে হেগেল মৌলিক আলোচনা করিয়াছেন। জাতির আত্মা বাস্তব, মুক্ত এবং স্বাধীন ; কিন্তু জাতির ভৌগোলিক পরিবেশের ছাপ এই আত্মার উপরে থাকিতেই হইবে। এইরূপ উক্তিতে কোন কিছুর ব্যাখ্যা হইল কি ; স্পার্টার ইতিহাস আলোচনা সম্পর্কে হেগেল বলিয়াছেন—স্পার্টানদের আচার ব্যবহার এবং রাষ্ট্রগড়ন প্রজ্ঞারই বিকাশের কতকগুলি স্তর মাত্র। এইরূপ উক্তিদ্বারা স্পার্টার ইতিহাসের কতখানি আমাদের বোধগম্য হইল ? হেগেল নিজেও সম্ভবত ছায়ার উপরে নির্ভর করিয়া থাকা যুক্তিসঙ্গত মনে করিয়া উঠিতে পারেন নাই। তাই এক এক সময় হেগেল তাহার যুক্তিকে দৃঢ় বুনিয়াদের উপর দাঁড় করাইতে চাহিয়াছেন। এক জায়গায় তিনি খুব জোর করিয়া বলিয়াছেন, লেকিডিমোনিয়ার পতনের প্রধান কারণ ধনবন্টনের অসমতা। "Lacedaemonia fell...........chief as the result of the inequality of property" এই সত্য উক্তির পশ্চাতে কিছুমাত্র অলীক ভাববাদ লুক্কায়িত নাই।

ধরা যাউক যেন একজন বৈজ্ঞানিক শারীরতত্ত্বের সূত্রধারা জীবজন্তুর চলৎশক্তির কারণগুলি স্পষ্ট করিয়া বুঝাইলেন। বৈজ্ঞানিকভাবে এইরূপ বলার পরে যদি তিনি আরো বলেন যে, জীবজন্তু চলার সময়ে যে ছায়াটি তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলে ইহাই হইল চলৎশক্তির পিছনকার মূল কারণ অথবা পরম শক্তি, তবে এই যুক্তি নিতান্ত অবান্তর এবং অদ্ভুত শোনায়। সামাজিক বিষয় সম্পর্কে বাস্তব এবং বৈজ্ঞানিক বিচার করিয়া পরিশেষে যদি বলা হয়—আত্মাই হইল মূল কারণ তবে তাহাও উপরোক্ত যুক্তির মতো উদ্ভট হইয়া উঠে।

গ্রীক দার্শনিক এপিকুরাস বিশ্বের ফাঁকে ফাঁকে তাহার কল্পিত দেবতাগণের অবস্থানের জায়গা করিয়া দিয়াছিলেন ; অবশ্য তিনি বলিতে ভুলেন নাই যে এই

দেবতাগণের সঙ্গে বিশ্বের কোন সম্পর্ক নাই। খাঁটি ভাববাদী আত্মা এবং বস্তুকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন দুইটি সত্তারূপেই কল্পনা করেন। হেগেল দর্শনের এইরূপ দ্বৈতমূলক কোন্ সংস্কার ছিল না। হেগেল বস্তুকে প্রজ্ঞারই অন্য-অস্তিত্বরূপে (other being) দেখিয়াছেন। রবার্ট ফিন্ট হেগেল দর্শন সম্পর্কে উল্লেখ করিয়াছেন, ভাববাদী দর্শনের বিভিন্ন শাখার ভিতরে হেগেল দর্শনই সর্বাপেক্ষা বিশদ : বস্তুবাদের সম্মুখে হেগেল-দর্শন অত্যন্ত দুর্বল অন্তরায় : কেন না 'আত্মা'র নিরর্থক প্রক্ষেপকে বাদ দিলে দেখা যাইবে হেগেল দর্শন বস্তুবাদের ভিত্তির উপরই দাঁড়াইয়া আছে।

মার্কস হেগেল দর্শনের দুইটি ত্রুটি দেখাইয়াছেন। হেগেল বলেন, চরম-প্রজ্ঞার আত্মজ্ঞান (self-consciousness) জন্মায় দর্শনের ভিতরে। যদি তাহাই হয়, তবে যে দার্শনিক দর্শন রচনা করিতেছেন তিনিই তো চরম প্রজ্ঞা। দ্বিতীয়ত ইতিহাস যদি চরম-প্রজ্ঞারই সৃষ্টি হয়, আর এই চরম-প্রজ্ঞা দর্শনের ভিতরে সচেতন হয়, তবে কি দার্শনিকের মতামতের উপরই ইতিহাস-রচনা নির্ভর করে না?

মার্কসের সমাজ-তত্ত্ব

আঠারো শতকের ফরাসী বস্তুতন্ত্রীদের মত ছিল, সমাজকে নিয়ন্ত্রণ এবং শাসন করে জনমত (public opinion) ; এই জনমত সমাজ-পরিবেশের সৃষ্ট, ইহার প্রকাশ হয় রাষ্ট্র-বিধির ভিতর দিয়া। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক হইতেই এই মত বর্জিত হইতে লাগিল।

বিখ্যাত ঐতিহাসিক Guizot বলিলেন, অধিকাংশ লেখক সমাজের বিকাশের মূল খুঁজিয়া বাহির করিয়াছেন রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির ভিতরে। ইহাদিগকে বিচারের মূল বিষয় না করিয়া গোড়ায় সমাজকে বুঝিবার চেষ্টা করিলেই বুদ্ধিমানের কাজ হইত। তিনি ইহাও বলিয়াছেন, রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠানগুলি কারণ হিসাবে কাজ করিবার পূর্বে অন্য কতকগুলি কারণ হইতে ইহাদের উদ্ভব হইয়াছে। সমাজকে ইহারা নিয়ন্ত্রণ করে বটে, কিন্তু প্রথমত সমাজই ইহাদিগকে জন্ম দিয়াছে। ঐতিহাসিকের দৃষ্টি সর্বপ্রথম আকর্ষণ করিবে সমাজের বিভিন্ন পরিবর্তন, স্তর এবং অবস্থাগুলি, কেননা বিভিন্ন লোকের এবং শ্রেণীর পরস্পর সম্বন্ধে নির্ধারিত হইবে এইসব পরিবর্তন দ্বারা। কীভাবে শাসনকার্য রাষ্ট্র পরিচালনা করে, তাহার পূর্বে বুঝিতে হইবে কি প্রকারে সমাজের লোকগুলি জীবনযাপন করে।

Guizot আরো খানিকটা অগ্রসর হইয়া বলিলেন, আধুনিক জাতিগুলির জীবনে দেখা যায়, জমি-সম্পর্কিত বিষয়ের সহিত মানুষের জীবন অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। সুতরাং জাতির রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে গবেষণার পূর্বে জমি-সম্বন্ধীয় আলোচনাই প্রথম কর্তব্য। Guizot এই দৃষ্টির সাহায্যেই Merovingian এবং Carlovingian-দের সময়কার ফরাসী-ইতিহাস লিখিয়াছেন। আরো কিছুটা অগ্রসর হইয়া ইংল্যান্ডের বিপ্লব সম্পর্কে তিনি লিখিয়াছেন, এই বিপ্লব আধুনিক সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীগুলির সংঘর্ষেরই একটি চিত্র। এখন হইতে Guizot জমি সম্পর্কের (land relations) জায়গায় বিত্ত-সম্পর্কেই (property relations) রাজনৈতিক আন্দোলন এবং বিপ্লবের মূলীভূত কারণরূপে ধরিলেন।

Augustin Thierry-ও একই মতে আসিয়া পৌঁছিলেন। ইংল্যান্ড এবং ফরাসীর ইতিহাস আলোচনায় তিনি দেখাইয়াছেন, রাষ্ট্রনৈতিক বিকাশের মূল কারণ সামাজিক বিকাশ। এই কারণটি সাধারণত লোকচক্ষুর অন্তরালেই লুক্কায়িত থাকে। ফরাসী বস্তুতন্ত্রীদের মতো তিনি বলেন নাই যে জনমতই জগতকে চালাইতেছে। জনমতের সংজ্ঞা তিনি দিয়াছেন, ইহা শ্রেণী স্বার্থেরই প্রকাশ এবং স্ফুরণ। ইংল্যান্ডে চার্লস প্রথমের বিরুদ্ধে পার্লামেন্টের সংগ্রাম সম্পর্কে Thierry খুব বিশেষত্ব-পূর্ণ আলোচনা

করিয়াছেন। বিবদমান দুইটি দলের একটির লক্ষ্য ছিল রাষ্ট্র ক্ষমতা এবং বিলাস-সম্ভোগ ; অপরটির আদর্শ ছিল স্বাধীনতা অর্জন এবং শারীরিক শ্রম দ্বারা উৎপাদন। রাজার পক্ষে যোগ দিল বিলাস এবং সম্ভোগ ছাড়া জীবনে অন্য কিছু যাহাদের ভাবিবার প্রয়োজন ছিল না। উৎপাদনের সঙ্গে যাহাদের যোগ ছিল তাহারা "কমন্স" আখ্যা পাইল। স্বার্থ লইয়াই এই দুই দলে সংগ্রাম বাঁধিয়াছিল। রাজার বিপক্ষে যাহারা যুদ্ধ করিয়াছিল ধর্ম-বিশ্বাসের দিক হইতে তাহারা প্রিসবিটেরিয়ান শ্রেণীভুক্ত। ধর্মের ব্যাপারে কোন রকমের জোয়াল ঘাড়ে বহন করিয়া চলিতে ইহারা অনিচ্ছুক। অপর পক্ষীয়রা ধর্ম-বিশ্বাসের দিক হইতে ছিল এপিস্‌কোপেলিয়ান। অর্থাৎ ধর্মকার্যে ইহারা চায় কতিপয়ের কর্তৃত্ব এবং ধর্মের নামে ট্যাক্স আদায়ের সুযোগ।

বাহ্যত মনে হয় Thierry বুঝি পরিষ্কারভাবেই সকল কথা বলিয়াছেন, কিন্তু বস্তুত তাহা নয়। কি সূত্র-অনুসারে শ্রেণীস্বার্থ বিশেষ একটি রূপ পরিগ্রহ করে তাহা কি তিনি বলিতে পারিয়াছেন ? কি হেতু সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর জন্ম হয়, সে সম্পর্কে কোনও নির্দেশ তাহার নিকট আমরা পাই নাই।

Guizot এবং Thierry-র পরে প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক Mignet। কিন্তু তিনিও বেশিদূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই। অবশ্য ইহারা সকলেই এতটুকু ধারণা করিয়াছিলেন যে সমাজ-বিকাশের মূলতত্ত্বটি অর্থনৈতিক বিষয়ের ভিতরেই খুঁজিতে হইবে। ফরাসী-বিপ্লব ছিল বুর্জোয়া অভিজাত স্বার্থের সংগ্রাম ; এই সংঘর্ষের পরে ঐতিহাসিকগণের এতটুকু ধারণা মোটেই আশ্চর্যের বিষয় নয়। ফরাসী-বিপ্লবের পর 'Restoration' যুগের ঐতিহাসিকেরা বিনা দ্বিধায় অতি সহজেই 'শ্রেণীসংঘর্ষ' কথাটি ব্যবহার করিতেন। শুধু ব্যবহারই করিতেন না 'শ্রেণীসংঘর্ষ' থিওরিটির প্রতি তাহাদের যথেষ্ট সহানুভূতিই ছিল। রক্তের এবং রক্তপাতের ভয় তাহাদের সে সময়ে বড় একটা ছিল না। Thiers তাহার ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাসে পরিষ্কারই বলিয়াছেন, "So I repeat, war i. e. revolution, was essential. God gave just icemen only at the price of struggle." মধ্যবিত্তশ্রেণী যতদিন পর্যন্ত অভিজাতবর্গের বিরুদ্ধে তাহাদের সংগ্রাম সমাধা করিতে পারে নাই, ততদিন ঐতিহাসিকগণ শ্রেণীসংঘর্ষকে সমর্থন করিয়া বিপ্লবী-মনোবৃত্তির পরিচয় দিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। অবশ্য পরবর্তীযুগে বুর্জোয়া বনাম প্রলেতারিয়েত সংগ্রাম যখন আত্মপ্রকাশ করিল এবং তীব্র রূপ লইল তখন আবার তাহারা শ্রেণীসংঘর্ষ তত্ত্বটিকে অত্যন্ত সংকীর্ণ বলিয়া প্রমাণিত এবং প্রচার করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই।

হেগেল সম্ভবত অনিচ্ছাসত্ত্বে এই অপ্রতিরোধ্য সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন যে জাতির ভাগ্য নির্ধারিত হয় বিত্ত-সম্পর্ক দ্বারা। 'Restoration' যুগের ফরাসী ঐতিহাসিকেরাও তাহাই করিয়াছিলেন। কিন্তু ভাববাদী দার্শনিক অথবা বস্তুবাদী ঐতিহাসিক, কেহই আসল সত্যটি উদ্‌ঘাটিত করেন নাই। সমাজের বিশিষ্ট গড়ন অথবা বিত্তের বিশেষ বিশেষ রূপ কিসের উপরে নির্ভর করে যতদিন এই সমস্যাটি অমীমাংসিত রহিয়া গেল, ততদিন তাহারা সোল্লাসে এবং সহজে বলিতে

পারিয়াছেন— প্রাকৃতিক বিজ্ঞানগুলিই যথার্থ বিজ্ঞান, সমাজ-বিজ্ঞান নির্ভরযোগ্য নয়।

এই আলোচনা হইতে দেখা গেল, মার্কসের এবং ডায়ালেকটিকেল বস্তুবাদের পথ পূর্ব হইতেই পরিষ্কৃত হইয়া আছে। মার্কস তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "ক্রিটিকে" (critque of Political economy) সমাজ ও ইতিহাসের মূল সূত্রটি বিশদভাবে এবং স্পষ্টাক্ষরে বর্ণনা করিয়াছেন।

সামাজিক উৎপাদনের ভিতরে যোগদান করিয়া মানুষকে নির্দিষ্ট কতকগুলি সম্পর্কের ভিতরে ঢুকিতে হয়। ইহা তাহার পক্ষে অপরিহার্য ; যখন এইরূপ ঘটে তাঁহার মতের অপেক্ষা রাখিয়া তাহা ঘটে না। উৎপাদনের এই সম্পর্কগুলি উৎপাদন শক্তির বিকাশের নির্দিষ্ট স্তরের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া চলে। উৎপাদনের ভিতরের এই সম্পর্কগুলির সমষ্টিই হইল সমাজের অর্থনৈতিক গড়ন। ইহাই আবার রাষ্ট্র-সম্পর্কিত বিধি-ব্যবস্থাগুলির ভিত্তি। মানুষের সামাজিক চেতনার (social consciousness) বিভিন্নরূপও ইহার সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া বিকশিত হয়।

উৎপাদনের সম্পর্ক, এই শব্দটির অর্থ কি ? ব্যবহারশাস্ত্রে ইহাকে বলা হয় বিত্ত সম্পর্ক (property relation). Guizot এবং হেগেল এই বিত্ত-সম্পর্ক সম্বন্ধেই ইঙ্গিত করিয়াছিলেন। মার্কস এই বিত্তসম্পর্ক কি করিয়া সঞ্জাত হয় তাহাই বর্ণনা করিয়াছেন। মানুষ সামাজিক জীব ; সমাজের বিভিন্ন শক্তির প্রভাবেই যে সে বর্ধিত হয় তাহা ফরাসী ঐতিহাসিক এবং জার্মান ভাববাদী উভয়েই জানিতেন। কিন্তু সামাজিক শক্তিগুলি যে মানুষের সামাজিক-অস্তিত্বেরই (social existence) যাবতীয় বিষয় তাহা ইহাদের চোখে পড়ে নাই। সমাজের বিকাশ নিয়ন্ত্রিত হইবে উৎপাদন শক্তির (productive forces) বিকাশ দ্বারা ইতিহাস সম্পর্কে মার্কসের ধারণাকে পণ্ডিতশ্রেণী সংকীর্ণ এবং একদেশদর্শী আখ্যা দিয়া থাকেন। কিন্তু তাহারা লক্ষ্য করেন না যে পূর্বতন ঐতিহাসিক ধারণা এবং সূত্রগুলিরই পরিণতি মার্কসতত্ত্ব। এগুলির ভিতরে যথার্থ মূল্য যাহা রহিয়াছে তাহাই মার্কসতত্ত্বে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে এবং মার্কসতত্ত্বেই ইহার সুদৃঢ় ভিত্তি লাভ করিয়াছে। সুতরাং হেগেলের ভাষা ধার করিয়া বলা যাইতে পারে, মার্কসতত্ত্ব ইতিহাসের প্রশস্ত এবং পরিপূর্ণ অর্থ-বিচার।

আঠারো শতকের দার্শনিকেরা বারংবার বলিয়াছেন—মনুষ্য-ইতিহাসের মূলকথা "মানুষের স্বভাবজাত প্রকৃতি" (Human Nature)। যতগুলি "রাম রাজ্যের" (utopia) পরিকল্পনা তাহারা রচনা করিয়াছেন তাহাদের প্রত্যেকটিরই পশ্চাতে রহিয়াছে মানুষের এই স্বভাবজাত প্রকৃতির ধারণা। শুধু আঠারো শতকের দার্শনিকেরাই নয়, যে সকল ঐতিহাসিকগণের কথা আমরা উল্লেখ করিয়াছি তাহারাও এই 'মনুষ্য প্রকৃতি'র হাত হইতে নিষ্কৃতি পান নাই। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, এই মনুষ্য প্রকৃতির দোহাই দিয়া একদল যে সকল উপসংহার করিয়াছেন, অপরদল হয়তো বা করিয়াছেন সম্পূর্ণ বিপরীত।

আমরা সকল সময়ই দেখিতে পাই যে মনুষ্য-প্রকৃতির পরিবর্তন হইতেছে। কিন্তু যাহারা মনুষ্য প্রকৃতির দোহাই দিয়া সামাজিক বিষয় এবং ঘটনাগুলির ব্যাখ্যা করিতে

চান, তাহারা ইহাকে অপরিবর্তনীয় ধরিয়া লন। কিন্তু যাহা অপরিবর্তনীয় তাহা দ্বারা কীভাবে পরিবর্তনশীল সমাজের ব্যাখ্যা সম্ভব হইতে পারে? মনুষ্য-প্রকৃতি যে পরিবর্তন-সাপেক্ষ, জার্মান ভাববাদীরা তাহা পূর্বেই ধরিয়াছিলেন; এই পরিবর্তনের মূল মনুষ্য মনের বহির্ভূত একটি সত্য, তাহাও ইহারা ধারণা করিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাদের এই সত্যটি হইল অনন্তপ্রজ্ঞা। মার্কসতত্ত্ব এই সকলের অসারতা প্রতিপন্ন করিয়া বলিয়াছে,—মানুষের বাহিরের যে প্রকৃতি তাহার উপর শ্রম প্রয়োগ করিয়া মানুষ যেমন প্রকৃতিকে পরিবর্তন করিতেছে, তেমনি আপন স্বভাবেরও পরিবর্তন ঘটাইতেছে। মনুষ্য-প্রকৃতিরও একটি ইতিহাস রহিয়াছে; এই ইতিহাসকে জানিতে হইলে বুঝিতে হইবে কি উপায়ে মানুষ তাহার বাহিরের প্রকৃতিকে প্রভাবান্বিত করে।

Helvetius চেষ্টা করিয়াছিলেন, মানুষের শারীরিক চাহিদাকে ভিত্তি করিয়া যদি সমাজ-বিকাশকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়। কিন্তু কি করিয়া এই অভাব পরিপূরণ এবং চাহিদা মিটানো সম্ভব হয় তাহাই দেখা হইল মূল কথা। মার্কসতত্ত্ব ঠিক এই জায়গা হইতেই তাহার গবেষণা শুরু করিয়াছে।

প্রকৃতি পশুর জন্য খাদ্য ছড়াইয়া রাখিয়াছে; সংগ্রহ করিয়া লওয়াই ইহাদের কাজ। খাদ্য কুড়াইয়া লইতে তাহারা প্রয়োগ এবং পরিচালনা করে আপন আপন অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির। সুতরাং পশুর পক্ষে প্রাকৃতিক পরিবেশের সহিত অভিযোজন (adaptation) সম্ভব হয় শারীরিক গড়নের, বিশেষ করিয়া অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির পরিবর্তনদ্বারা। কিন্তু যে জীব Homo Sapiens বলিয়া পরিচয় দিতে গর্ব বোধ করে তাহার পক্ষে খাদ্য-সংগ্রহ ব্যাপারটি এতো সহজে সম্ভবপর হয় না। মানুষ প্রকৃতিরই সৃষ্ট জীব; প্রকৃতির সম্মুখীন হয় সে তাহারাই অন্যতম শক্তিরূপে প্রকৃতিজাত দ্রব্যাদি আপন চাহিদা-মিটানোর উপযোগী করিয়া পাইবার জন্য মানুষ তাহার হাত-পা-মাথা প্রভৃতি অঙ্গাদি খাটাইয়া থাকে। এ সকল দ্রব্যাদি মানুষ পায় উৎপাদন দ্বারা; উৎপাদন কার্যের জন্য তাহার পক্ষে প্রয়োজন হইয়া পড়ে হাতিয়ারের ব্যবহার। পশু যেমন পায় মানুষও তেমনি প্রকৃতির নিকট হইতে কতকগুলি তৈয়ারি খাদ্য পায় বটে; কিন্তু সাধারণত সে প্রকৃতির নিকট হইতে এমন কতকগুলি জিনিস সংগ্রহ করিয়া লয় যাহাকে আখ্যা দেওয়া হয়, উৎপাদন কার্যের হাতিয়ার।

এই হাতিয়ারকে মানুষ তাহার হাতের সহিত সংযোজন করিয়া আপন আয়তন বৃদ্ধি করিয়া লয়। বাইবেলের কথা,—মানুষ কখনো তাহার ঈশ্বরদত্ত আয়তন বৃদ্ধি করিতে পারে না। কিন্তু মার্কস উপহাস করিয়া বাইবেলের কথার প্রত্যুত্তর দিয়াছেন, স্বাভাবিক হাত দুটিকে কৃত্রিম হাতিয়ার দিয়া পরিপূরণ করিলেই এই আয়তন বৃদ্ধি সম্ভবপর হয়। ঠিক এই কারণেই মানুষের পক্ষে অস্তিত্বের সংগ্রাম পশু হইতে মূলত অন্য রকমের। মানুষের পক্ষে প্রাকৃতিক পরিবেশের সহিত অভিযোজন সম্ভব হয় কৃত্রিম অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি অর্থাৎ হাতিয়ারের পরিবর্তন দ্বারা। ইহাদের পরিবর্তনের তুলনায় শারীরিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির পরিবর্তন নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। ডারউইন এক

জায়গায় বলিয়াছেন, যে সকল ইউরোপীয় আমেরিকায় গিয়া বসবাস করে তাহাদিগকে শীঘ্রই কতকগুলি শারীরিক পরিবর্তন প্রত্যক্ষ করিতে হয়। কিন্তু ইহাও ডারউইন বলিয়াছেন যে এই পরিবর্তন নিতান্তই নগণ্য। এই কারণেই হাতিয়ার এবং যন্ত্রপাতি-নির্মাণকারী জীব হিসাবে মানুষ তাহার বিকাশের একটি নতুন পর্যায়ে উপনীত হয়; তাহার বায়োলজিকেল বিকাশ এই খানেই শেষ হইয়া ঐতিহাসিক বিকাশ শুরু হয়।

অনেকের ধারণা মানুষ ছাড়া অন্য কোন জীব বুঝি হাতিয়ার ব্যবহার করে না; ডারউইন তাহা অস্বীকার করিয়াছেন। শিম্পাঞ্জি পোষ মানিবার পূর্বেই পাথরের সাহায্যে ফল ভাঙিয়া খায়। ভারতবর্ষে দেখা গিয়াছে, হাতী তাহার বন্যজীবন পরিত্যাগের পর গাছের ডাল ভাঙিয়া মশামাছি তাড়ায়। ডারউইন হয়তো বা সত্যই বলিয়াছেন; কিন্তু আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে সংখ্যাত্মক পরিবর্তন হইতেই গুণাত্মক পরিবর্তন সম্ভব হয়। মানুষ ছাড়া অন্যান্য জীবের ভিতরে হাতিয়ারের ব্যবহার থাকিলেও তাহা অত্যন্ত অল্প এবং অপরিণত। পশুর জীবনে হাতিয়ারের প্রভাব সুনিশ্চিত এবং নিঃসন্দেহ। এই অর্থেই মার্কস বলিয়াছেন, হাতিয়ার নির্মাণ এবং হাতিয়ার ব্যবহার পশুর ভিতরে দেখা গেলেও ইহা মনুষ্যসমাজেরই বিশেষত্ব।

যে সকল হাতিয়ার দ্বারা মানুষ কাজ করে অথবা যে সকল যন্ত্রাদির উপরে মানুষ প্রত্যক্ষভাবে শক্তি প্রয়োগ করে, সেগুলি ছাড়াও অন্যান্য কতকগুলি যন্ত্রের কথা মার্কস উল্লেখ করিয়াছেন। এই সকল যন্ত্রের কাজ হইল উৎপাদনের উপকরণাদি ধারণ করা অথবা যে সকল যন্ত্রাদিদ্বারা শক্তি-প্রয়োগ করা হয় তাহাদের সহায়করূপে কাজ করা। প্রথমোক্ত যন্ত্রগুলিই অধিক প্রয়োজনীয়। মাটির তল হইতে পুরাতন হাড় উদ্ধার করিয়া যেমন লুপ্ত কতকগুলি জীবের সন্ধান পাওয়া সম্ভব হয়, তেমনি পুরাতন হাতিয়ার এবং যন্ত্রাদির ধ্বংসাবশেষের গবেষণা ও পর্যালোচনা হইতেও বিলুপ্ত সামাজিক স্তরগুলিরই অর্থনৈতিক এবং সামাজিক গড়ন সম্পর্কে সন্ধান মিলিতে পারে। উৎপাদনরীতি অর্থাৎ উৎপাদন-কার্যে মানুষের শ্রম কীভাবে ব্যবহৃত হইতেছে তাহা দ্বারাই বুঝিতে পারা যায়। অর্থনৈতিক যুগগুলির একে অন্যে তারতম্য। ডারউইন প্রাণীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির উদ্ভব এবং বিকাশ অর্থাৎ 'Natural technology' সম্পর্কে আমাদের সচেতন করিয়াছেন; মার্কস মানুষের কৃত্রিম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির যথার্থ অর্থ উদ্ধার করিয়া সমাজ-প্রগতির স্তর নির্ণয় দ্বারা ইতিহাসের মূল অর্থটি আমাদের নিকট প্রকাশিত করিয়াছেন। Vico একবার বলিয়াছিলেন, মানুষের ইতিহাস এবং প্রকৃতির ইতিহাস দুয়ের ভিতরে পার্থক্য এই যে প্রথমোক্তটির উপরে রহিয়াছে মানুষের হাত; কিন্তু দ্বিতীয়টির উপর মানুষের কোনো হাত নাই; তাই যদি হয়, তবে কি natural technology-র গবেষণা হইতে human technology-র ইতিহাস রচনা সহজসাধ্য নয়?

এ যুগের পুরাতাত্ত্বিকগণ পাথর যুগ, তাম্র যুগ এবং লৌহ যুগ এইভাবে সমাজ-প্রগতির স্তর নির্ধারণ করিয়াছেন। অস্ত্র-শস্ত্র এবং আসবাবপত্র প্রভৃতি তৈয়ারির উপকরণের প্রভেদ এবং তারতম্য হইতেই এই স্তর নির্ণয় সম্ভব হইয়াছে। কিন্তু

পুরাবিদেরা এই আবিষ্কারের মূল অর্থ কি তাহা বুঝাইবার কোনো চেষ্টাই করিলেন না। আঠারো শতকে Condorcet অতি আদিমযুগ হইতে শুরু করিয়া কৃষির যুগ পর্যন্ত উৎপাদন সংক্রান্ত হাতিয়ার প্রভৃতির বিকাশ সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন। Condorcet এতোখানি পর্যন্ত বলিয়াছেন যে অস্ত্রাদি তৈয়ারি, খাদ্যাদি-প্রস্তুত এবং এই সকল কার্য সংক্রান্ত যথোপযুক্ত উপকরণ সংগ্রহ এবং নির্মাণ—এই সকল বিশেষত্বগুলি দ্বারাই পশু এবং মনুষ্য সমাজের মূলগত বিভিন্নতা শুরু হইয়াছে। তিনি পরিষ্কারভাবেই বুঝিয়াছিলেন সমাজ-কাঠামোর উপর কৃষির কতখানি প্রভাব। এইভাবে অগ্রসর হইতে হইতে তিনি দেখাইলেন, উৎপাদনরীতির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়াই জ্ঞান-বিজ্ঞানেরও বিকাশ সম্ভব হইতেছে। সহসা এক জায়গায় আসিয়া condorcet মত বদলাইলেন এবং সকল কিছু উলটাইয়া ফেলিলেন। ঐহিক বিষয়ে এবং অস্তিত্বের সংগ্রামে মানুষ যাহাই আবিষ্কার করিয়াছে এবং যে সকল কীর্তি রাখিয়াছে তাহার সকল কিছুই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে আত্মার (spirit) অগ্রগতি হইতে। তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন, মূল বিষয় মানুষের আত্মিক শক্তি; ইহার নিকটই মানুষ তাহার সকলরকম উদ্ভাবনের জন্য ঋণী। আত্মার স্বাভাবিক ধর্ম সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইয়া চলা। এ যুগের অর্থনীতিজ্ঞ কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, উৎপাদনশক্তির উদ্ভাবন, উদ্ভব এবং বিকাশ আত্মার অগ্রগতিরই বিষয়।

প্রাণীতত্ত্ব নির্দেশ দিবে যে মানুষের স্বাভাবিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির বিকাশ হইয়াছে প্রাকৃতিক পরিবেশের ভিতরে; ইতিহাসেও আমরা দেখিব যে কৃত্রিম অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির বিকাশেরও মূলীভূত সত্য এই প্রাকৃতিক পরিবেশ। যে দেশে ধাতব পদার্থ কিছুই নাই সেখানে নিশ্চয়ই পাথর অপেক্ষা ভালো উৎপাদনে হাতিয়ার তৈয়ারি সম্ভব হইতে পারে না। প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং ভৌগোলিক আবেষ্টনীর প্রভাব উৎপাদনের উপর থাকিবেই।

মার্কস কেপিটেল গ্রন্থে বলিয়াছেন, জমির উর্বরতাই সবটুকু নয়; কতরকমের উৎপাদন জমিতে হইতে পারে তাহাই বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। কেন না ইহা দ্বারাই সমাজে শ্রম-বিভাগ (social division of labour) নিরূপিত হইবে। বহুবিধ উৎপাদন দ্বারা প্রকৃতিকে মানুষ যতই পরিবর্তন করিতে পারিবে, ততই মানুষের চাহিদাও বাড়িবে; উৎপাদনের সামর্থ্য এবং শক্তিও বর্ধিত হইবে; শ্রমের উপকরণ এবং প্রকার একাধিকরূপ ধারণ করিবে। প্রাকৃতিক শক্তিকে মানুষের শ্রম এবং বুদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করিয়াছে এবং কাজে লাগাইয়াছে; যাহাতে প্রাকৃতিক উদাহরণ এবং উপাদানগুলি অপব্যয় না হয় তাহা দেখিয়াছে। উৎপাদন এবং শিল্পের ইতিহাসে এগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরা যাইতে পারে মিশরের হাইড্রলিক ওয়ার্কস ভারতবর্ষের এবং মিশরের সেচ কার্য।

প্রকৃতির সঙ্গে লড়িবার জন্য মানুষ তাহার প্রাকৃতিক পরিবেশ হইতেই হাতিয়ার এবং যন্ত্রাদি তৈয়ারির উপযুক্ত উপাদান সংগ্রহ করিয়া লয়। উৎপাদন কার্য এবং উৎপাদনের উপকরণ কি বিশিষ্ট প্রকারের হইবে তাহা নির্ধারিত করে ভৌগোলিক

আবেষ্টনী। একটি সেনাবাহিনীর ভিতরে সৈনিকগণের পরস্পর সম্বন্ধ ঠিক হয় অস্ত্রের কি বিশিষ্টরূপ তাহা দ্বারা। উৎপাদন ক্রিয়ার ভিতরেও যন্ত্রাদি এবং হাতিয়ারের রূপ দ্বারা একে-অন্যের ভিতরে সম্বন্ধ নিরূপিত হইবে। এই সম্বন্ধই আবার সমাজের কি বিশেষ গড়ন হইবে তাহাও ঠিক করিবে। এই আলোচনা হইতে আমাদের বোধগম্য হইবে কি উপায়ে প্রাকৃতিক আবেষ্টনী মানুষের সামাজিক-পরিবেশকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতেছে-কৃষিকার্যের সুবিধার জন্য নীল নদীর জোয়ার ভাটার সময় পূর্ব হইতে জানার প্রয়োজন হইয়া পড়িল। এইরূপ প্রয়োজন এবং চেষ্টা হইতে জন্ম হইল জ্যোতির্বিজ্ঞানের। তখন হইতে মিশরে একটি পুরোহিত শ্রেণীর আবির্ভাব হইয়াছে।

বিষয়টির মাত্র একটি দিকই আমরা দেখিলাম। উৎপাদনশক্তি (productive force) এইখানে কাজ করিয়াছে কারণ-রূপে; উৎপাদন সম্বন্ধে (productive relations) হইয়াছে কার্য। কিন্তু যাহা কার্য তাহাই আবার কারণকে নতুন করিয়া বিকশিত করিতে পারে। এই সূত্র হইতে দুইটি সিদ্ধান্ত সম্ভব।

১। উৎপাদন শক্তি এবং উৎপাদন সম্বন্ধেরই পরস্পর প্রভাবের ফল সমাজ প্রগতি। এই প্রগতির অন্তর্নিহিত সূত্র সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, প্রাকৃতিক পরিবেশের সহিত ইহার কোনো সম্পর্ক নাই। ব্যক্তিগত বিত্ত (private property) প্রথম যখন বিকশিত হয়, যেন ইহা উৎপাদনকারীর আপন শ্রমেরই ফল হইয়া থাকে। কিন্তু এমন একটি সময় আসে যখন ব্যক্তিগত বিত্তের চেহারার পরিবর্তন অপরিহার্য হইয়া উঠে। অপরের শ্রমপ্রসূত বিত্তের অধিকারী হয় পুঁজিপতি। এই বিত্ত আর উৎপাদনকারীর আপন বিত্ত না থাকিয়া পুঁজিপতির ব্যক্তিগত বিত্তে পরিণত হয়। এই রূপ অবস্থা সংগঠিত হইল ব্যক্তিগত বিত্তের বিকাশের ধারার অন্তঃস্থিত সূত্রের ফলস্বরূপ। প্রাকৃতিক পরিবেশের এই স্থলে প্রত্যক্ষ কোনো প্রভাব ছিল না; উৎপাদন শক্তিকে যথাসম্ভব শীঘ্র বিকশিত হইবার উপযোগী অনুকূল অবস্থার সৃষ্টিই শুধু ইহা করিতে পারে।

২। প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রত্যক্ষ কোন প্রভাব সমাজ-বিকাশের উপরে নাই। একই জাতি হয়তো বা বহুশতাব্দী যাবত একই প্রকারের অথবা সামান্য পরিবর্তিত ভৌগোলিক আবেষ্টনীর ভিতরে বাস করিতেছে; কিন্তু জাতির সামাজিক গড়ন যুগের পর যুগ বহুভাবে পরিবর্তিত হইয়াছে। এই নির্দশন হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে সামাজিক বিকাশের একটি স্বতন্ত্র সূত্র রহিয়াছে। প্রাকৃতিক পরিবেশ প্রত্যক্ষভাবে সমাজকে প্রভাবান্বিত করে না দেখিয়া কেহ কেহ এই সত্যটিকে একেবারেই অস্বীকার করিয়া গিয়াছেন। ইহাদের ভিতরে অন্যতম ভলটেয়ার। সত্তর শতকের ইংল্যাণ্ডের উৎপাদনশক্তি পূর্বগামী ঐতিহাসিক বিকাশেরই ফল। কিন্তু এই ঐতিহাসিক বিকাশে ভূগোলের কিছুমাত্র দান নাই বলা অসঙ্গত। ভূগোল তাহার প্রভাব কীভাবে সঞ্চারিত

করিয়াছে তাহা বুঝিতে হইবে অন্য উপায়ে। দেশের অর্থনৈতিক বিকাশের উপরই ইহার প্রকৃত প্রভাব।

"ক্রিটিকে" মার্কস বলিয়াছেন, উৎপাদনশক্তি বিকশিত এবং পরিবর্ধিত হইতে হইতে এমন একটি অবস্থায় আসিয়া দাঁড়ায় যে প্রচলিত বিত্ত-সম্পর্কাদির সহিত তাহার বিরোধিতা না হইয়াই পারিবে না এখন এই বিত্ত সম্পর্ক উৎপাদন শক্তির সহিত সংগতি রক্ষা করিতে না পারিয়া তাহাকে শৃঙ্খলিত করিতে তৎপর হয়। এই অবস্থাটিতেই উদ্ভূত হয় সমাজ-বিপ্লব (social revolution)। ফিউদতন্ত্র হইতে পুঁজিবাদে পরিবর্তনের সময়ে সমাজের এইরূপ অবস্থা আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। আধুনিক সময়েও পরিষ্কারই আমরা দেখিতেছি যে উৎপাদনশক্তি দ্রুত বিকাশের পথে অগ্রসর হইয়া চলতি বিত্ত সম্পর্কের আমূল পরিবর্তন দাবি করিতেছে; কিন্তু পরবর্তীটি প্রথমটিকে শৃঙ্খলিত এবং অচল করিয়া তুলিবার চেষ্টায় রহিয়াছে। এই সংঘর্ষের সমন্বয় দ্বারা অর্থনৈতিক ভিত্তিটির রূপান্তর হইল সমগ্র সমাজের এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির চেহারাও বদল হইতে পারে।

অর্থনৈতিক পরিবর্তনকে রাষ্ট্র, সমাজ এবং ধর্মাত্মক ভাবাদর্শের (ideology) রূপগুলি হইতে পৃথক করিয়া দেখিতে হইবে। এই সকল ভাবাদর্শগুলি হইতেই মানুষ এই বিরোধ সম্পর্কে সচেতন হয়। একজন লোক তাহার নিজের সম্পর্কে কিরূপ ভাবে তাহা দ্বারা যেমন এই লোকটি সম্পর্কে সঠিক ধারণা করা সম্ভব নয়, তেমনি একটি যুগের পরিবর্তন বুঝিবার জন্য সে যুগের সামাজিক-চেতনাকে বুঝিয়া লওয়াই যথেষ্ট নয়। কেননা এই সামাজিক-চেতনাই নিয়ন্ত্রিত হয় মানুষের ঐহিক জীবনের বিষয়গুলি দ্বারা।

সকল সামাজিক তথ্যই আপন নিরসনকে ডাকিয়া আনে এবং এই বিলোপ হইতে নতুনরূপে পুনরায় আত্মপ্রকাশ করে। এই ডায়ালেকটিক সূত্রটি সমাজ এবং রাষ্ট্রের সকল প্রতিষ্ঠান এবং বিধি ব্যবস্থাগুলির পক্ষেই খাটে। সকল সামাজিক-রূপই প্রথম অবস্থায় উৎপাদনশক্তির বিভিন্ন রূপ প্রকাশ মাত্র; বিকাশের সময়টিই ইহাদের জীবনকালের সেরা এবং সুপ্রশস্ত সময়। বিকাশের ধারা যখন উত্তরোত্তর অগ্রসর হইতে থাকে তখনই লোকের ধারণা জন্মে এইটিই সমাজের প্রকৃত, অকৃত্রিম, অনাবিল রূপ। কিন্তু ধীরে ধীরে যখন বিশেষ একটি রূপ জরাগ্রস্ত হইতে থাকে, তখন তাহারা ইহার বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়, একটি শয়তানের সৃষ্টি, প্রকৃতি-বিরুদ্ধ এইরূপ বিদ্রোহাত্মক উক্তি করিয়া ইহাকে বিধ্বস্ত করিবার জন্য উদ্যত হয়।

এইরূপ অবস্থা ঘটিবার একমাত্র কারণ উৎপাদনশক্তি পূর্বে যাহা ছিল, এখন আর তাহা নাই। উৎপাদনশক্তি অধিকতর বিকশিত হওয়ার জন্য সমাজের অন্তর্ভুক্ত লোকগুলির পরস্পর সম্বন্ধের ভিতরে পরিবর্তন ঘটিয়াছে। ক্রমিক সংখ্যাত্মক পরিবর্তন পর্যবসিত হইয়াছে গুণাত্মক প্রভেদে। ক্রমিক পরিবর্তনের এইখানেই গতিরোধ হইয়াছে। হেগেলই এই ডায়ালেকটিক ব্যাখ্যায় এবং কারণ নির্ণয়ে আশ্রয় লইয়াছেন অতীন্দ্রিয়শক্তির। মার্কস সম্পূর্ণই নির্ভর করিয়াছেন বাস্তব-কারণের উপর। সমাজের

হাতে যে সকল উৎপাদনের উপায় অথবা শক্তি রহিয়াছে তাহার বিকাশ হইতেই যে সামাজিক বিপর্যয় এবং রূপান্তর সংগঠিত হয় তাহাই মার্কস প্রমাণ করিয়াছেন।

মার্কসের এই আবিষ্কার কতিপয়ের স্বার্থের বিরোধী; তাই এই আবিষ্কারে সহজে ইহাদের প্রতীতি জন্মে না। জার্মান দার্শনিক ফিক্টে বলিয়াছিলেন, It is easier to bring the majority of people to consider themselves as bits of lava in the moon than as themselves. মানুষ যথার্থত যাহা নয় তাহাতে তাহার প্রতীতি সহজে জন্মে, কিন্তু তাহার জীবনের যাহা প্রকৃত মূল তাহাতে তাহার বিশ্বাস জন্মানো কঠিন। জীবিকাই জীবনের মূল তাহাতে তাহার বিশ্বাস জন্মানো কঠিন। জীবিকাই জীবনের মূল, এই সূত্র ধরিয়াই মার্কস সমাজতন্ত্র বিশ্লেষণ করিয়াছেন। হেগেল তাহার প্রসিদ্ধ Philisophy of History গ্রন্থে এরিস্টটলের কথা উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন, "When pressing needs are satisfied, man turns to the general and more elevated." (p.80) মার্কস 'কেপিটেল' গ্রন্থের একটি অধ্যায়ের পাদ-টীকায় মহাকবি সেকসপীয়রের একটি চমৎকার উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন—

"you take my life
when you take the means whereby I live"

(P-533)